বেঙ্গল টাইমস

সময় থেকে এগিয়ে

দীপাবলি সংখ্যা



bengaltimes.in

ISSN 2445 5657

সূচিপত্র

দীপাবলি সংখ্যা ২০২৬



প্রচ্ছদ কাহিনি

ভাগ্যিস একজন মহেন্দ্র গুপ্ত ছিলেন

❑ স্বরূপ গোস্বামী

ধর্মের সীমানা পেরিয়ে শ্যামাসঙ্গীত

❑ অরিত্র গুপ্ত

পানশালা থেকে শ্যামাসঙ্গীত

❑ অজয় কুমার

কিছুই ফুরিয়ে যায়নি

❑ দিব্যেন্দু দে

স্পেশ্যাল ফিচার

পুজোয় বেড়ানোর এমন হিড়িক কেন?

❑ ঋত্বিক বসু

মেসেজের কপি পেস্ট নয়

❑ মলয় সেন

ভাইফোঁটাও পৌঁছে গেল

রেস্টুরেন্টে!

❑ সঞ্জীব রায়

রাজনীতি

কে শমীক ভট্চাজ? তাঁর সঙ্গে

বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই

❑ অজয় কুমার

স্বপনের নম্রতাই আসল সাহসিকতা

❑ সৃজন শীল

বইমেলার আঙিনায় তিনিও কিন্তু অবাঞ্ছিত

❑ স্বরূপ গোস্বামী

বিনোদন

একেনবাবুকে এবার রেহাই দিন

❑ স্নেহা সেন

নিজস্বতা আনতে গিয়েই ব্যুমেরাং হয়ে গেল

❑ বিপ্লব মিশ্র

পঞ্চায়েতের মতোই, গ্রাম চেনার সহজ পাঠ

❑ বিপ্লব মিশ্র

ওপেন ফোরাম

ধনতেরাসে এত আদিখ্যেতা কীসের?

❑ সঞ্জয় সেন

খেলা

এমন বিদায় কি সামির প্রাপ্য ছিল?

❑ দেবায়ন কুণ্ডু

ভ্রমণ

রবি ঠাকুর কিন্তু এখানে এসেছিলেন

❑ উত্তম জানা

bengaltimes.in

ISSN 2445 5657

বেঙ্গল টাইমস প্রকাশন। সম্পাদকীয় কার্যালয়: কেবি ১২, সেক্টর ৩, সল্টলেক, কলকাতা ১০৬। ফোন: ৯৮৩১২২৭২০১, আইএসএসএন ২৪৪৫ ৫৬৫৭, ওয়েবসাইট www.bengaltimes.in

সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী

সম্পাদকীয়

শুভ দীপাবলি

শরৎ, হেমন্ত এই ঋতুগুলোও যেন প্রায় হারিয়েই গিয়েছিল। মোটামুটি এগারো মাস গরম কাল। টেনেটুনে এক মাস শীতকাল। এটাই বাংলার সাম্প্রতিককালের ঋতুচক্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনকী রচনার বইয়েও বোধ হয় শরৎকাল, হেমন্তকালের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে গিয়েছিল। এবার পরিস্থিতি একটু হলেও অন্যরকম। গরম ছিল ঠিকই, তবে বর্ষা এসে তাকে অনেকটাই প্রশমিত করেছে। শরতের ঝলমলে নীল আকাশে দিব্যি সাদা মেঘের ভেলা ছিল। ভুলতে বসা হেমন্ত যেন একটু একটু করে সুর ছড়িয়েছে। আর শীত! এখনও তেমন কাঁপুনি আসেনি ঠিকই, তবে দীপাবলির আগেই কেমন যেন একটা হিমের পরশ। কবির ভাষায় বলতে হয়, শীত এলে বসন্ত আর কতই বা দূর!

গত বছর অক্টোবরের মাঝামাঝি ছিল দীপাবলির আয়োজন। এবার শারদোৎসবই হয়েছে অক্টোবরের মাঝামাঝি। ফলে দীপাবলি এসেছে নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে। শীত শীত একটা আমেজ যেমন আছে, তেমনই রাজ্যে পালাবদল আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রেও অনেক বদল এনেছে। ধর্ম আর উৎসব মিলেমিশে দিব্যি ছিল। অন্তত উৎসবকে ঘিরে হুঙ্কার আর আস্ফালনের ছবিটা

তেমন প্রকট ছিল না। কিন্তু এবার পুজোয় বইয়ের স্টল ভাঙাকে কেন্দ্র করে যা যা ঘটেছে, তা রাজ্যের ভাবমূর্তিকে মোটেই উজ্জ্বল করেনি। বইয়ের স্টল ভাঙতে বুলডোজার আসছে, এটা কোনও সরকারের কাছ থেকেই কাম্য নয়। ভুল থেকে সরকার শিক্ষা নেবে নাকি আরও বেপরোয়া হবে, সেটা সময় বলবে। পুজোকে ঘিরে উৎসব আর আনন্দের আমেজটাই বজায় থাকুক। বিনা প্ররোচনায় অহেতুক অশান্তি ডেকে আনার খেলায় মেতে না ওঠাই কাম্য।

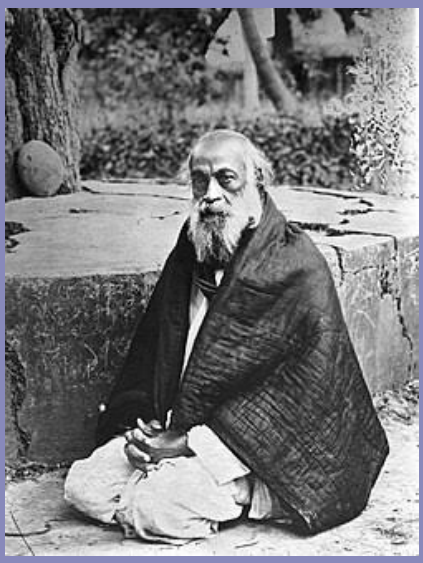
জীবন থেমে থাকে না। সে এগিয়ে চলে নিজের গতিতেই। পুজো সংখ্যার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার হাজির দীপাবলি সংখ্যা। রাজনীতি, খেলা, সাহিত্য, সিনেমা সর্বত্রই নানা ঘটনাপ্রবাহ থাকবে। বিতর্ক থাকবে। সেগুলোকে সীমিত পরিসরে একটু ছুঁয়ে দেখা। পাশাপাশি পুরনো কিছু নস্টালজিয়াকে একটু উস্কে দেওয়া। কিছু পুরনো বিভাগের পাশাপাশি কিছু নতুন বিভাগকেও শামিল করার একটা চেষ্টা। স্বল্প পরিসরে, স্বল্প সময়ে আবার ডানা মেলল বেঙ্গল টাইমস। সেই উড়ানে আপনাদেরও সাদর আমন্ত্রণ।

স্বরূপ গোস্বামী
সম্পাদক,
বেঙ্গল টাইমস

চাটুজ্যে বামুনের বদ্যি পাবলিসিটি অফিসার। তখনকার দিনে বেশ চালু একটা কথা। এই চাটুজ্যে বামুনই বা কে? আর বদ্যি পাবলিসিটি অফিসারটিই বা কে? প্রথমজন গদাধর চ্যাটার্জি। যাঁকে বাঙালি শ্রীরামকৃষ্ণ নামে চেনে। আর দ্বিতীয়জন মহেন্দ্র গুপ্ত। পেশায় শিক্ষক। পরবর্তীকালে শ্রীম নামে পরিচিত। তাঁকে কি লেখক বলা যায়! যদিও তিনি নিজে নিজেকে কখনও লেখক বলে মনে করতেন না। কিন্তু একটু একটু করে বাংলা ভাষার একটি আকর গ্রন্থ লিখে ফেলেছেন। বইয়ের নাম? শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত।

সারা পৃথিবীজুড়ে ছড়িয়ে আছে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা। কত হাজার হাজার সন্ন্যাসী ছড়িয়ে আছেন পৃথিবীর নানা প্রান্তে। এতকিছুর পরেও রামকৃষ্ণ আমাদের কাছে অনেকটাই অধরা থেকে যেতেন যদি এই মহেন্দ্র গুপ্ত না থাকতেন। রামকৃষ্ণ বিচিত্র সব নামে তাঁকে ডাকতেন। কখনও বলতেন মাস্টার, কখনও হেডমাস্টার। কখনও বলতেন ইংলিশম্যান, আবার কখনও মহেন্দ্র মাস্টার। এই মাস্টারের দীর্ঘ প্রচেষ্টাতেই বাঙালির ঘরে ঘরে পৌঁছে গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

অনেকে বলতেই পারেন বিবেকানন্দের কথা। কিন্তু রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর এই বিবেকানন্দের বড় একটা সময় কেটেছে ভারত ভ্রমণ ও বিশ্ব ভ্রমণে। ফিরে আসার পরেও সেভাবে রামকৃষ্ণের কথা প্রচার করার সুযোগ পেলেন কই? বড্ড তাড়াতাড়িই পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন। তাছাড়া, তিনি নিজেই এক জ্বলন্ত সূর্য। নিজেই কিংবদন্তি। বেদ-বেদান্ত থেকে শুরু করে ধর্ম-পুরাণ নানা ব্যাপারে তাঁর ব্যাখ্যা শোনার জন্যই



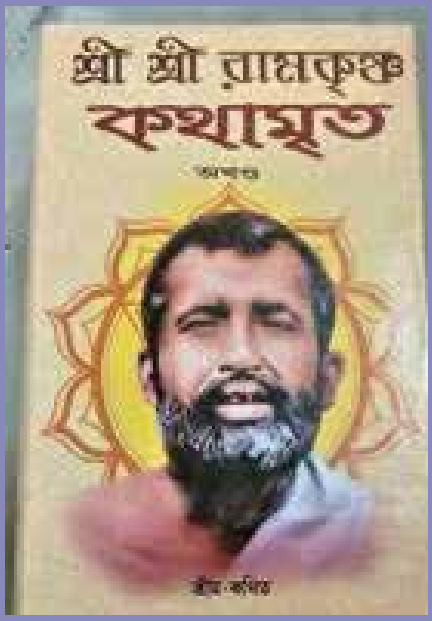
ভাগ্যিস একজন মহেন্দ্র গুপ্ত ছিলেন!

স্বরূপ গোস্বামী



বসে থাকতেন ভক্তরা। কিন্তু মহেন্দ্র গুপ্ত নিজে সেলিব্রিটি ছিলেন না। ফলে, তিনি এক মুগ্ধ ভক্তের মতোই অনন্ত সময় ধরে রামকৃষ্ণকে কাছ থেকে দেখে গেছেন। বাড়ি ফিরে সেইসব কাহিনি লিখে গেছেন। লিখতে লিখতে কখনও রাত পেরিয়ে ভোরও হয়ে গেছে। ডায়েরিতে লিখে রাখা সেইসব ঘটনা কখনও বই হয়ে বেরোবে, লোকের ঘরে ঘরে পৌঁছে যাবে, এমনটা তাঁর সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না।

এই মহেন্দ্র গুপ্ত আসলে বিবেকানন্দের শিক্ষক। বিবেকানন্দও তাঁকে মাস্টারমশাই বলেই ডাকতেন। পিতৃবিয়োগের পর অর্থাভাবে বিবেকানন্দ তখন দিশেহারা। হেডমাস্টার মহেন্দ্র গুপ্তই তাঁকে চাকরি দিয়েছিলেন মেট্রোপলিটন স্কুলে। সেটি ছিল বিদ্যাসাগরের তৈরি করা স্কুল। বিদ্যাসাগর তৈরি করলেও স্কুলের সেক্রেটারি ছিলেন তাঁর জামাই। দৈনন্দিন কাজ সেই জামাই বাবাজীবনই দেখাশোনা করতেন। তাঁর আবার নরেনকে নানা কারণে ভাল লাগত না। ফলে, এই চাকরি বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারেননি নরেন। অবশ্য মাস্টারমশাইও বেশিদিন সেই স্কুলে রইলেন না। একসময় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তিনিও মেট্রোপলিটন স্কুল ছেড়েই দিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ? তিনি নাকি মন দিয়ে স্কুল করছেন না। মাঝে মাঝেই রামকৃষ্ণের কাছে চলে যাচ্ছেন। সেই চাকরি ছেড়ে যখন রামকৃষ্ণের কাছে এলেন, রামকৃষ্ণ বলে বসলেন, বেশ করেছো, বেশ করেছো, বেশ করেছো।



কিন্তু এদিকে অর্থাভাব বেড়ে চলেছে মাস্টারমশাইয়ের। স্কুল থেকে এবার কাজ নিলেন কলেজে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রতিষ্ঠিত রিপন কলেজে। পরে চাকরি নিয়েছিলেন সিটি কলেজেও। পড়াতেন ইংরাজি, মনোবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস। একসময় একসঙ্গে তিনটি স্কুলে কাজ করেছেন। তিনটি স্কুলের উপার্জন খরচ করতেন তিনটি খাতে। একটি স্কুলের টাকা যেত বরাহনগরের মঠে, গুরুভাইদের সেবায়। একটি স্কুলের টাকা দান করতেন সারদামণি ও সন্ন্যাসীদের জন্য। আরেকটি স্কুলের টাকা খরচ হত নিজের সংসারের কাজে।

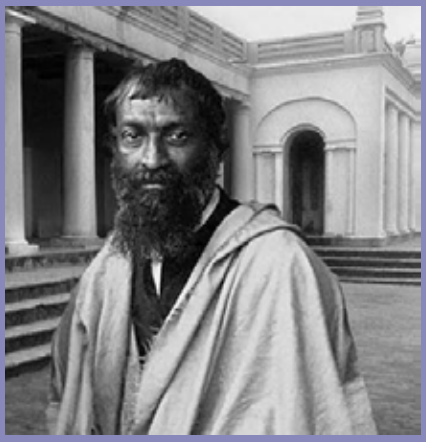
এবার কথামৃতে আসা যাক। রামকৃষ্ণের সঙ্গে মহেন্দ্রবাবুর আলাপ ১৮৮২-র ফেব্রুয়ারি নাগাদ। রামকৃষ্ণের মৃত্যু হয় ১৮৮৬-র আগস্টে। অর্থাৎ, এই সাড়ে চার বছর রামকৃষ্ণের নিবিড় সান্নিধ্য পেয়েছেন। বয়সে তিনি রামকৃষ্ণের থেকে ১৮ বছরের ছোট। সময় হলেই চলে যেতেন দক্ষিণেশ্বরে। সবকিছু খুঁটিয়ে শুনতেন। সবসময় যে রামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে খোশগল্প করতেন, এমন নয়। নানাপ্রান্ত থেকে ভক্তরা আসতেন। সেই তালিকায় তখনকার সমাজের দিকপালরাও ছিলেন। তাঁরা রামকৃষ্ণকে কী বলছেন, রামকৃষ্ণ তাঁদের কী বলছেন, সব খেয়াল রাখতেন। রাতে বাড়ি ফিরে বসে যেতেন ডায়েরি লিখতে। সবকিছু খুঁটিয়ে লিখে রাখতেন। এমনকী লিখতে লিখতে কখনও সকাল হয়ে যেত। অনেক সময় অনেককিছু হয়ত মনে পড়ছে না। মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত অস্থিরতা। বারবার মনে করার চেষ্টা করতেন। হয়ত ঘুমের মাঝেই মনে পড়ল। অমনি উঠে পড়ে লিখে নিতেন।

কিন্তু হঠাৎ এই ডায়েরি লেখার ইচ্ছে হল কেন? নিজেই জানিয়েছেন, ছোট বেলায় পড়েছিলেন চৈতন্য চরিতামৃত। আবার ডায়েরি লেখার অভ্যেসটাও সেই ছোটবেলার। শুরুতে নিজের কথাই লিখতেন। বন্ধুদের কথা লিখতেন। বাড়ির লোকের কথা লিখতেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের সঙ্গে সাক্ষাতের পরই মনের ভেতর আমূল এক পরিবর্তন এল। মনে হল, এই মানুষটার কথাগুলো যদি লিখে রাখতে পারি! এভাবেই একটু একটু করে লেখার শুরু। কথামৃতের প্রাণপুরুষ বারবার জানিয়েছেন, কারও জন্য নয়, এই লেখা লিখেছিলাম শুধু নিজের জন্যই। লিখে আনন্দ পেতাম। এটাই ছিল পরম প্রাপ্তি।

এই লেখাকে তিনি যে জনসমক্ষে আনতে চাননি, তা নানা ঘটনা পরম্পরা থেকেই বোঝা যায়। কারণ, রামকৃষ্ণের মৃত্যুর অন্তত ষোল

বছর পর বেরিয়েছে প্রথম খণ্ড। যদি সত্যিই আত্মপ্রচারের জন্য লিখতেন, তাহলে ষোল বছর অপেক্ষা করতেন না। পরের বছরই লিখে ফেলতেন। আসলে, রামকৃষ্ণের মৃত্যুর এগারো বছর পর তাঁকে নিয়ে ইংরাজিতে একটি পুস্তিকা বেরোলো। তখন অনেকে তাঁকেও পরামর্শ দিলেন লেখাগুলো একটু একটু করে সামনে আনতে। কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের বেশ কুণ্ঠাই ছিল। তিনি ডায়েরি নিয়ে গিয়ে পড়ালেন সারদা মা-কে। সারদামণি দরাজ প্রশংসা করলেন। বললেন, তোমার লেখা পড়ে মনে হচ্ছে, উনি নিজেই কথা বলছেন। সারদা তখন বেশিরভাগ সময় থাকতেন জয়রামবাটিতে। সেখানেও গুরু মায়ের কাছে ছুটে গেছেন মহেন্দ্র গুপ্ত। সারদার কাছ থেকে সাহস পেয়ে মনে হল, এবার এই ডায়েরির কিছু অংশ পাঠকের সামনে উন্মুক্ত করা যায়।

বিক্ষিপ্তভাবে বঙ্গদর্শন, উদ্বোধন, হিন্দু পত্রিকা, জন্মভূমিতে বেরিয়েছে। প্রথমে নাম ছিল শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলামৃত। পরে নাম হল শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথা। তারপর ১৮৯৯ নাগাদ নাম হল শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতম। সেখান থেকে নাম হল শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত। প্রথম বই হয়ে বেরোলো ১৯০২ সাল নাগাদ। সেই বছরই মৃত্যু হল স্বামী বিবেকানন্দের। স্বয়ং রামকৃষ্ণর জীবন নিয়ে বই লেখা হবে, অথচ কোনও প্রকাশক পাননি কথামৃতের লেখক। নিজের টাকা থেকেই বই বের করেছেন। পরের খণ্ডগুলি বেরিয়েছে ১৯০৪, ১৯০৮, ১৯১০ নাগাদ। এই চারটি খণ্ড লেখার পর ২২ বছরের বিরতি। এর মাঝে একের পর এক ঝড়ঝাপটা এসেছে তাঁর জীবনেও। শরীরও ভেঙে পড়েছিল। আর লিখতে পারবেন কিনা, নিজের ভেতরেই সংশয়



ছিল। এদিকে, তাঁর লেখা চার খণ্ড বই তখন ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। অবশেষে, পঞ্চম খণ্ড দিনের আলো দেখল ১৯৩২ নাগাদ। সেই পঞ্চম খণ্ড ছাপার অক্ষরে, বই আকারে দেখে যেতে পারেননি। যেদিন তাঁর মৃত্যু হয়, তার আগের রাতে দেখেছেন পঞ্চম খণ্ডের ফাইনাল প্রুফ।

শোনা যায়, আরও দু'খণ্ড লেখার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আর হয়ে উঠল না। ডায়েরি থেকে জানা যাচ্ছে, দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে ৭১ বার। বইয়ে ২৫৫ জন ভক্ত ও আগন্তুকের কথা আছে। সেই তালিকায় সেই যুগের দিকপাল লোকেরাও ছিলেন। সাল, তারিখ ধরে ধরে পুঙ্খানুপুঙ্খ লিখে গেছেন। এমনই ঝরঝরে ভাষা, যে কেউ বুঝতে পারবেন। সহজবোধ্য ভাষার কারণেই বইগুলি ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছে।

একটি সূর্যের আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে কত প্রান্তে। একটা জীবনের চারপাশে আরও কত জীবন। আড়ালেই থেকে যান মহেন্দ্র গুপ্তরা। আড়াল থেকে তাঁরা আলো দেখান। সেই আলোয় আরও স্পষ্ট দেখা যায় পরমহংসদেবকে।

ধর্মের সীমানা পেরিয়ে শ্যামাসঙ্গীত



অরিত্র গুপ্ত

পুজো আসছে, তার জানান দেয় একটা চেনা কণ্ঠস্বর। মহালয়ার ভোরে বেজে ওঠে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে 'মহিষাসুরমর্দিনী'। সেই কণ্ঠ, সেই মন্ত্রোচ্চারণ, সেই সুরের আবহে বাঙালি বুঝে যায়, দুর্গাপুজো এসে গিয়েছে। মহালয়ার অনেক আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় এই প্রস্তুতি। রেডিও, টেলিভিশন, পাড়ার মণ্ডপ, বাড়ির পুজো—সব জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়ে উৎসবের আমেজ।

তারপর আসে পুজো। কয়েকটা দিন আনন্দ, আড্ডা, ঘোরাঘুরি, খাওয়াদাওয়া। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই দরজায় কড়া নাড়ে কালীপুজো। বদলে যায় সুরের আবহ। দুর্গার আগমনী থেকে আমরা চলে আসি শ্যামাসঙ্গীতের জগতে। আর তখনই কোথাও না কোথাও বেজে ওঠে পান্নালাল ভট্টাচার্যের গান। তাঁর দরদভরা কণ্ঠে 'আমার সাধ না মিটিল', 'মায়ের পায়ের জবা হয়ে' কিংবা 'শ্যামা মা কি আমার কালো' শুনতে শুনতে কখন যে মনটা অন্য কোথাও চলে যায়, বোঝা যায় না।

কিন্তু এই শ্যামাসঙ্গীতের আসরে আরও একজনের উপস্থিতি থাকে। হয়তো আমরা খেয়াল করি না। তিনি কাজি নজরুল ইসলাম। 'বল রে জবা বল', 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন', 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা', 'আর লুকাবি কোথায় মা', 'ভুল করেছি ও মা শ্যামা',



‘শ্মশানে জাগিছে শ্যামা’,মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়’ —একের পর এক গান আমাদের পরিচিত। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। কেউ হয়তো গুনগুন করে গেয়েছেন, কেউ পুজোর অনুষ্ঠানে শুনেছেন, কেউ আবার কালীপুজোর রাতে মণ্ডপে দাঁড়িয়ে উপভোগ করেছেন। কিন্তু এই গানগুলোর রচয়িতা যে কাজি নজরুল ইসলাম, সেটা অনেকেরই জানা নেই। অবশ্য একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। নইলে কোনও কোনও অর্বাচীন হয়তো ফতোয়া জারি করে বসত, এই গান সনাতনী গান নয়। এই গান মণ্ডপে বাজানো যাবে না। জেহাদি, দেশদ্রোহী কত বিশেষণই না জুটে যেত। আর সেগুলোই দিনভর প্রচার হত। হাজার হাজার বিকৃত কমেন্টের বন্যা বয়ে যেত।

যে কবি ইসলামের গান লিখেছেন, হামদ-নাত রচনা করেছেন, তিনিই আবার লিখেছেন শ্যামাসঙ্গীত। শুধু লিখেছেন বললে কম বলা হয়, মায়ের কাছে সন্তানের আকুলতা, অভিমান, ভালোবাসা আর আত্মসমর্পণের অনুভূতিকে এমনভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, যা ধর্মের পরিচয় ছাপিয়ে মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে যায়।

নজরুলের শ্যামাসঙ্গীতে মা কালী কখনও ভয়ঙ্করী, কখনও স্নেহময়ী। কখনও তিনি সন্তানের অভিমান ভাঙান, কখনও আবার তাঁর কাছে আশ্রয় চায় অসহায় মানুষ। ‘বল রে জবা বল’ গানে ফুলের কাছে যেন মায়ের খবর জানতে চাওয়া। আবার ‘কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন’ গানে কালোর মধ্যেই আলোর সন্ধান। কী অদ্ভুত ভাবনা! যে কালোকে অনেকে ভয় কিংবা অন্ধকারের প্রতীক মনে করেন, নজরুল সেই কালোর মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন আলোর উৎস।

এই গানগুলোর মধ্যে কোথাও কোনও কৃত্রিমতা নেই। নেই অন্য ধর্মের দেবীকে নিয়ে লেখার কোনও দূরত্ব। বরং আছে গভীর আত্মীয়তা। নজরুল যেন মায়ের কাছে নিজের মনের কথা বলছেন। কখনও প্রশ্ন করছেন, কখনও অভিমান করছেন, কখনও আবার শিশুর মতো আঁকড়ে ধরছেন মায়ের আঁচল। সেই আবেগই গানগুলোকে এত আপন করে তুলেছে।

একবার ভাবুন, যে সময়ে সমাজে ধর্মীয় বিভাজন ছিল, সাম্প্রদায়িকতার বিষও মাথাচাড়া দিচ্ছিল, সেই সময়ে একজন



মুসলিম কবি কালীকে নিয়ে এমন গান লিখছেন, সুর দিচ্ছেন, গাইছেন। এ কোনও লোকদেখানো সম্প্রীতির বার্তা নয়। এ তাঁর নিজস্ব বিশ্বাস, তাঁর সংস্কৃতি, তাঁর শিল্পীসত্তার প্রকাশ। নজরুলের কাছে ধর্মের পরিচয়ের চেয়ে বড় ছিল মানুষের পরিচয়। তাই তাঁর কলমে যেমন এসেছে শ্যামাসঙ্গীত, তেমনই এসেছে ইসলামের গান। একই সৃষ্টিশীল মন থেকে বেরিয়ে এসেছে দুই ভিন্ন ধর্মের আরাধনার গান।

আর মজার ব্যাপার, আমরা সেই গানগুলোকে আলাদা করে ধর্মের চোখে দেখিনি। কালীপুজোর রাতে মণ্ডপে বসে যখন ‘বল রে জবা বল’ শুনেছি, তখন একবারও মনে হয়নি, এই গান লিখেছেন একজন মুসলিম কবি। গান শুনেছি, সুরে ডুবেছি, গুনগুন করে গেয়েছি। কবির ধর্মপরিচয় আমাদের আনন্দের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

হয়তো এটাই শিল্পের সবচেয়ে বড় সার্থকতা। শিল্পী তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে এমন এক জগৎ তৈরি করেন, যেখানে জাতপাত, ধর্ম, সম্প্রদায়ের দেওয়ালগুলো ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে যায়। গান তখন আর কোনও বিশেষ ধর্মের সম্পত্তি থাকে না। হয়ে ওঠে সবার।

নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত তাই শুধু কালীপুজোর গানের তালিকায় কয়েকটি জনপ্রিয় গান নয়। এর মধ্যে লুকিয়ে আছে বাংলার সংস্কৃতির এক বড় পরিচয়। যে বাংলায় রামপ্রসাদী গান শুনে মানুষ আপ্লুত হয়, সেই বাংলাতেই নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত সমান ভালোবাসায় গৃহীত হয়। পান্নালাল ভট্টাচার্যের কণ্ঠে সেই গান আরও এক অন্য মাত্রা পেয়েছে।

কালীপুজোর রাতে যখন চারদিকে আলো জ্বলে, মন্দিরে ঘণ্টা বাজে, প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে শ্যামাসঙ্গীত ভেসে আসে, তখন হয়তো আবারও বেজে উঠবে নজরুলের কোনও গান। আমরা শুনব, গুনগুন করব। হয়তো কবির নামটাও মনে পড়বে না।

তাতে অবশ্য গানের কিছু যায় আসে না। কারণ, নজরুল তো সেই কবে ধর্মের বেড়াজাল ভেঙে আমাদের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। তাঁর গানই বলে দেয়, সৃষ্টির কোনও ধর্ম হয় না।



পানশালা থেকে শ্যামাসঙ্গীত

অজয় কুমার

কালীপুজো এলেই একজনের কথা খুব মনে পড়ে। অমৃক সিং অরোরা। খুব ছোটবেলায় বাড়িতে তাঁর একটা ক্যাসেট দেখেছিলাম। কে এনেছিলেন, মনে নেই। একজন পাগড়ি পরা পাঞ্জাবি গায়ক। তিনি যে শ্যামা সঙ্গীত গাইছেন, সেটা বিশ্বাসই হত না। মনে হত, ক্যাসেটে হয়তো অন্য লোকের ছবি ছাপা আছে। যিনি গাইছেন, তিনি আসলে অন্য লোক। পরে একটি অনুষ্ঠানে তাঁর গান শুনি। নানা রকম অনুরোধ আসছে। আর তিনি হাসতে হাসতে সেই অনুরোধ রেখে চলেছেন।

ভারী আজব শহর এই কলকাতা। পরকে সে দিব্যি আপন করে নেয়। অবশ্য অমৃককে সেভাবে ‘পর’ বলা যায় না। তিনি অনেক

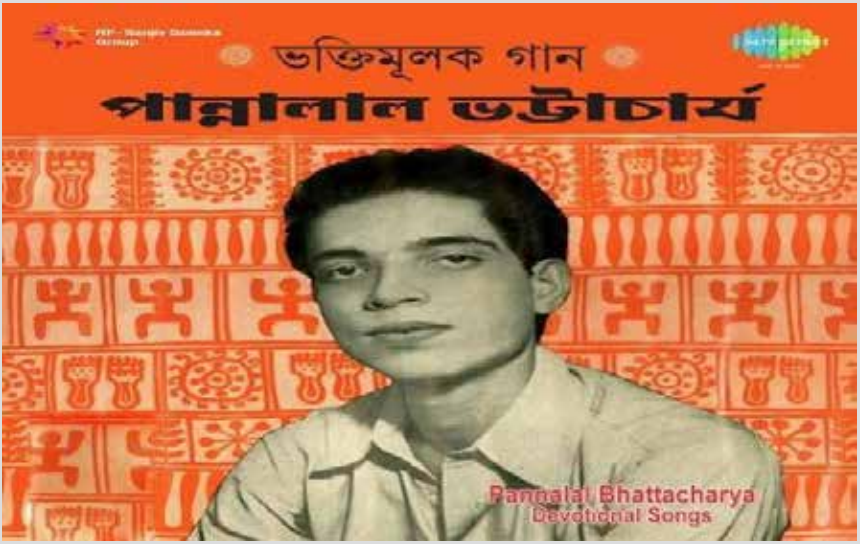


বাঙালির থেকেও বেশি মাত্রায় বাঙালি। তাঁর জন্মের অনেক আগেই তাঁর পূর্বপুরুষেরা কলকাতায় চলে আসেন। বাবা চেয়েছিলেন, ছেলে ব্যবসায়ী হোক। কিন্তু ছেলে ছোটবেলা থেকেই মেতে উঠেছিল গান নিয়ে। মায়ের সঙ্গে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গাইতে লাগল।

একটা সময় একটি পানশালায় গান গাওয়ার ডাক এল। সেখানে মূলত কিশোর কুমার, মহম্মদ রফির গান গাইতে লাগলেন। কিন্তু মনের মধ্যে বহুদিনের সুপ্ত ইচ্ছে, তিনি বাংলা গান গাইবেন। চলে গেলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। আর্জি রাখলেন, হেমন্তর সুরে গান গাইতে চান। হেমন্ত তাঁর গান শুনলেন। কিন্তু মনে হল, এই ছেলের গলায় বাংলা গান ঠিক মানাবে না। কিছুটা দুঃখই পেলেন অমৃক সিং। পরে অবশ্য বাংলা গান গাওয়ার সুযোগ এল। সাতের দশকের শেষদিকে পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা আর হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুর করা গানকে কণ্ঠে তুলে নিলেন। গানটি ছিল — রূপসী দোহাই তোমার। যাঁরা একটু হলেও গানবাজনার খোঁজ রাখেন, এই গানটির কথা তাঁদের অজানা নয়।

আটের দশকে তাঁর সঙ্গীত জীবন যেন অন্যদিকে বাঁক নিল। যে মানুষটা পানশালায় গিয়ে কিশোর-রফির গান গাইতেন, সেই মানুষটাই নিজেকে সমর্পণ করলেন ভক্তিগীতিতে। একের পর এক শ্যামাসঙ্গীত যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পেল তাঁর কণ্ঠে। প্রচলিত রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, নজরুলের গান তো ছিলই, তার পাশাপাশি তিনি তৈরি করলেন নতুন এক ঘরানা। 'আমার সর্ব অঙ্গে লিখে দিও কালী কালী নাম', 'কালী কালী বল রসনা', 'জয় মা তারা বলে ডুব' — গানগুলো মুখে মুখে ফিরতে লাগল। পাগড়ি পরা এই মানুষটাকে আপন করে নিল বাঙালি। তিনিও আপন করে নিলেন বাংলার লোকগীতি, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীতকে।

তাঁর অনুষ্ঠান মানেই বিরাট একটা অংশজুড়ে থাকত ভক্তিসঙ্গীত। প্রকাশভঙ্গিও ছিল বেশ মন কাড়ার মতো। একজন পাঞ্জাবি মানুষ এইভাবে একের পর এক শ্যামাসঙ্গীত, ভক্তিগীতি গেয়ে যাচ্ছেন, সত্যিই মুগ্ধ হওয়ার মতোই দৃশ্য। শোনা যায়, তিনি দু'হাজারের ওপর বাংলা গান গেয়েছেন। বড় তাড়াতাড়িই চলে গেলেন। এই প্রজন্ম হয়তো অমৃক সিংকে সেভাবে চিনল না। পুজো প্যান্ডেলেও তাঁর গান ইদানীং সেভাবে শোনা যায় না। যিনি বাংলাকে ভালবেসে এভাবে আপন করে নিলেন, আমরাও কি তাঁকে আরও একটু আপন করে নিতে পারি না!



কিছুই ফুরিয়ে যায়নি

দিব্যেন্দু দে

কালীপুজো এলেই বড় বেশি করে তাঁর কথা মনে পড়ে। তাঁর গাওয়া গানগুলো প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে, বাড়িতে বাড়িতে বেজে ওঠে।

কার কথা বলছি ? অনেকেই ধরে ফেলেছেন- পান্নালাল ভট্টাচার্য। আমাদের অনেকেরই বেড়ে ওঠার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর গান।

আমার জন্ম আটের দশকে। বাড়িতে যে খুব একটা ভক্তির পরিবেশ ছিল, এমনও নয়। নতুন টেপ রেকর্ডার এলে যা হয়! যার যেমন পছন্দ, সে তেমন ক্যাসেট কিনে আনে। পান্নালাল ভট্টাচার্যের ক্যাসেটটা কে কিনে এনেছিল, আজ আর মনে নেই। হতে পারে ছোট কাকা।

আমার কিশোর বয়সে ওই গান ভাল লাগবে কেন? তখন আমি কিশোর শুনছি, হেমন্ত শুনছি, পরের দিকে কুমার শানু শুনছি। পান্নালালকে



কিছুটা বেসুরোই মনে হত। যত সময় এগোলো, গানগুলো শুনতে শুনতে কেমন যেন অভ্যেস হয়ে গেল। কেন জানি না, গলাটা একটু একটু ভাল লাগতে শুরু করল। আমার সাধ না মিটিল, তুই নাকি মা দয়াময়ী, সকলই তোমারই ইচ্ছা, আমায় দে মা পাগল করে, আমার মায়ের পায়ের জবা হয়ে—এই সব গানগুলো নিজের মনেই গুনগুন করতাম।

পরে জানলাম, উনি ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের ভাই। আরও পরে জানলাম, মাত্র ৩৬ বছর বয়সেই তিনি নাকি আত্মহত্যা করেছিলেন। যিনি এমন ভক্তিগীতি গাইতেন, তিনি নিজেকে এভাবে কেন শেষ করে দিলেন ? নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করেছি। পরে নানা লোকের কাছে একটু একটু করে জেনেছি।

আগে দুই ভাইই নাকি শ্যামাসঙ্গীত ও আধুনিক-দুটোই গাইতেন। দাদা ধনঞ্জয়ের পরামর্শেই শ্যামাসঙ্গীতকেই বেছে নেন পান্নালাল। দুজনের মধ্যে একটা ভদ্রলোকের চুক্তি হয়ে গেল। ফিল্ম ছাড়া ধনঞ্জয় শ্যামাসঙ্গীত গাইবেন না। আর পান্নালাল আধুনিক গাইবেন না। এই বোঝাপড়াটা ঠিকঠাকই চলছিল। পারস্পরিক শ্রদ্ধা আর স্নেহে কোনও কার্পণ্যও ছিল না। দাদা ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য বলতেন, 'পান্নার মতো ও রকম নাড়ি ছেঁড়া মা ডাক ডাকতে পারলাম কই!'

কিন্তু একটু নাম-ডাক হলে যা হয়! অনেক রকম বন্ধু জুটে যায়। তাঁরাই কান ভাঙাতে লাগলেন পান্নালালের। বোঝানো হল, তিনি আধুনিক গান গাইলে ধনঞ্জয়ের বাজার থাকবে না। তাই তিনি ভাইকে সরিয়ে দিলেন। অনেকে বলেন, পান্নালাল নাকি সেই সময় এরকম প্রচারে বিশ্বাসও করেছিলেন। ফলে, দুই ভাইয়ের বাক্যালাপই বন্ধ হয়ে গেল। পরে সেই দূরত্ব কিছুটা কমলেও মাঝের সেই ফাটলটা থেকেই গিয়েছিল।

কিছুটা যেন হতাশই হয়ে পড়েছিলেন। মাঝে মাঝেই শ্মশানে চলে যেতেন। নিজের মনেই বিড়বিড় করে কথা বলতেন। বলতেন, এত মা –এর গান গাইলাম, মা দেখা দিচ্ছে না কেন? বাড়িতে তখন স্ত্রী ছাড়াও দুই মেয়ে। কিন্তু একটু একটু করে যেন সংসার সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়ছেন। একদিন নিলেন সেই চরম সিদ্ধান্তটা। কাউকে কিছু না জানিয়েই চিরতরে হারিয়ে গেলেন চেনা জগৎ থেকে।

ছয় দশক পেরিয়ে গেল। অনেক সাধ হয়ত মেটেনি। অনেক আশা পূরণও হয়নি। কিন্তু সব কি ফুরিয়ে গেল? এখনও প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে তাঁর গান ঠিক বেজে ওঠে। ফুরিয়ে যায়নি। সেই কণ্ঠ হয়ত অমরত্বই পেয়ে গেল।



পুজোয় বেড়ানোর এমন হিড়িক কেন?

ঋত্বিক বসু

পুজো এলেই বাঙালির সামনে একটা মস্ত প্রশ্ন। বাড়িতে থাকবেন, নাকি বেড়াতে যাবেন? গত কয়েক বছরে দ্বিতীয় বিকল্পটির দিকে ঝোঁক যেন একটু বেশিই। গ্রাম বা মফস্বলে এখনও এই প্রবণতা এখনও তেমন আসেনি। মূলত শহুরে বাঙালিদের মধ্যে এই প্রবণতা সবথেকে বেশি।

পুজোর ছুটি পড়ার আগেই ট্রেনের টিকিট, বিমানের ভাড়া, হোটেল বুকিং নিয়ে ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়। কেউ পাহাড়ে, কেউ সমুদ্রে, কেউ বা পাড়ি দেন ভিন রাজ্যে। পুজোর পাঁচটা দিন অন্য কোথাও কাটানোর মধ্যে একটা নতুনত্ব আছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, নিজের পাড়ার পুজো ছেড়ে, চেনা গলির আলোর রোশনাই ছেড়ে, এত দূরে গিয়ে সত্যিই কি পুজোর আনন্দটা পাওয়া যায়?

পুজো মানে তো শুধু ঠাকুর দেখা নয়। পুজো মানে অনেকগুলো মানুষের সঙ্গে দেখা হওয়া। যাদের সঙ্গে সারা বছর দেখা হয় না, তাদের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া। পুজো মানে সেই বন্ধুটি, যে চাকরির সূত্রে



বেঙ্গালুরুতে থাকে, কিংবা সেই সহপাঠী, যে এখন আমেরিকায়। সারা বছর ফোনে, হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ থাকলেও সামনাসামনি দেখা হয় না। পুজোর সময় তারা ফিরে আসে। কেউ দু'দিনের জন্য, কেউ চার দিনের জন্য। তারপর পাড়ার মণ্ডপে দেখা, পুরনো দিনের গল্প, একটু খুনসুটি, একটু অভিমান। মনে হয়, এই তো! এত দিন কোথায় ছিলি?

পাড়ার পুজোর একটা আলাদা মায়া আছে। যে মণ্ডপে ছোটবেলায় বাবার হাত ধরে ঠাকুর দেখতে যেতাম, যে মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে রাত জেগে আড্ডা দিয়েছি, যে ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করেছি, বয়স বাড়লেও সেই জায়গাগুলো বদলায় না। হয়তো বদলে যায় মুখগুলো। পুরনো অনেকেই আর নেই, নতুন প্রজন্ম এসেছে। তবু অষ্টমীর সকালে অঞ্জলি দিতে গিয়ে পরিচিত কারও সঙ্গে চোখাচোখি হলে মনটা কেমন যেন করে ওঠে। সন্ধ্যায় মণ্ডপে ঢুকতে গিয়ে পুরনো বন্ধুর কাঁধে হাত পড়ে। তারপর শুরু হয় গল্প। কোথায় আছিস, কী করছিস, বিয়ে করলি কবে, ছেলেমেয়ে কোন ক্লাসে পড়ে? সেই একই প্রশ্ন, সেই একই হাসি। অথচ এই সামান্য সময়টুকুই সারা বছরের জমে থাকা দূরত্ব মুছে দেয়।

পুজোর একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চ আছে এই আচমকা দেখা হওয়ার মধ্যে। কার সঙ্গে দেখা হবে, কে হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াবে, কোন পুরনো মুখটা ভিড়ের মধ্যে থেকে ডাকবে, তার কোনও ঠিক নেই। পাড়ার পুজোয় এই অনিশ্চয়তাটুকুও আনন্দের অংশ। এমনকী যাঁর সঙ্গে দেখা হলে দুটো কথা বলারও সময় পাওয়া যায় না, তাঁকেও দেখে ভালো লাগে। মনে হয়, মানুষটা আছে, ভালো আছে। এই তো অনেক!



বেড়াতে গেলে অবশ্য অন্য আনন্দ। নতুন জায়গা, নতুন রাস্তা, নতুন খাবার, পাহাড়ের মেঘ কিংবা সমুদ্রের ঢেউ। ছবি তোলা যায়, নতুন অভিজ্ঞতা হয়। কিন্তু সেখানে কি নিজের পাড়ার সেই মানুষগুলো থাকে? থাকে কি সেই পুরনো আড্ডার জায়গা? থাকে কি হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার সেই উত্তেজনা? হোটেলের ঘরে বসে যখন সোশ্যাল মিডিয়ায় পাড়ার পুজোর ছবি ভেসে ওঠে, বন্ধুরা একসঙ্গে দাঁড়িয়ে ছবি দেয়, তখন কি একটুও মন খারাপ হয় না? মনে হয় না, ইস্, এবার থাকলে মন্দ হত না!

আসলে পুজো শুধু একটা উৎসব নয়, একটা ফিরে আসার উপলক্ষ। যারা দূরে থাকে, তাদের কাছে বাড়ি ফেরার অজুহাত। যারা একই শহরে থেকেও ব্যস্ততার কারণে পরস্পরের থেকে দূরে সরে গিয়েছে, তাদের কাছে আবার কাছাকাছি আসার সুযোগ। পুজোর চারটে দিন যেন সবাইকে একটু সময় দেয়। কাজের চাপ, সংসারের দায়িত্ব, জীবনের হাজারো হিসেবের বাইরে গিয়ে কয়েকটা দিন শুধু নিজের মতো করে বাঁচার সুযোগ।

তাই পুজোয় বেড়াতে যাওয়া নিয়ে আপত্তি নেই। প্রত্যেকের আনন্দের ধরন আলাদা। কিন্তু যারা পুজোর সময় নিজের পাড়ায় থাকেন, তাঁরা যে অন্য রকম একটা সম্পদ উপভোগ করেন, সেটাও অস্বীকার করার উপায় নেই। পাহাড়ের মেঘ, সমুদ্রের ঢেউ, ঝরনার শব্দ নিশ্চয়ই সুন্দর। কিন্তু অষ্টমীর সন্ধ্যায় পাড়ার মণ্ডপে হঠাৎ পুরনো বন্ধুকে দেখে যে হাসিটা মুখে আসে, তার সঙ্গে কোনও দৃশ্যের তুলনা হয় না। আরও একটা মৌলিক বিষয় থেকে যায়। শুধু তো স্বামী, স্ত্রী যাচ্ছেন না। সঙ্গে ছেলে মেয়েরাও যাচ্ছে। এমনিতেই নিউক্লিয়ার ফ্যামিলিতে বেড়ে ওঠা এইসব কচিকাচাদের সঙ্গে পাড়ার বা এলাকার তেমন সম্পর্ক নেই। এখন থেকেই পুজোতে তারা যদি বাইরে যেতে শুরু করে, পুজোকে ঘিরে তাদের মধ্যে কোনও নস্টালজিয়াই তৈরি হবে না।

বছরের বাকি দিনগুলো তো থাকছেই। বেড়াতে যাওয়া যাবে অন্য কোনও ছুটিতে। কিন্তু পুজোর সেই চারটে দিন? সেই সময়টুকুতে সবাই যখন ফিরে আসে, তখন নিজের পাড়ায় না থাকার আক্ষেপটা হয়তো থেকেই যায়। কারণ, পুজো যতই সর্বজনীন হোক, তার সবচেয়ে বড় আনন্দটা লুকিয়ে থাকে কোথাও একটা নিজের মধ্যে। নিজের বাড়িতে, নিজের পাড়ায়, নিজের মানুষগুলোর ভিড়ে। আর সেই আনন্দের কোনও বিকল্প হয় না।



মেসেজের কপি পেস্ট নয়, চাই উষ্ণ আলিঙ্গন

মলয় সেন

সে এক সময় ছিল, যখন বিজয়া দশমী মানে অন্য এক আবেগ। দুপুরেই দেবীর বিসর্জন। একটা বিষাদের ছায়া। সেই বিষাদকে ছাপিয়ে সন্ধেয় দেখা যেত মহামিলন। আত্মীয়, প্রতিবেশী, বন্ধুদের বাড়ি যাওয়া। বড়দের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা, ছোটদের আশীর্বাদ করা, আর সমবয়সীদের সঙ্গে আলিঙ্গন বা করমর্দন। শুভ বিজয়া। এই একটি দিন যেন হঠাৎ করে একে অন্যের আরও কাছাকাছি এনে দিত।

এই বিজয়া উপলক্ষ্যেই কারও বাড়িতে তৈরি হত নারকেল নাড়ু। কারও বাড়িতে নানারকম মিষ্টি। কেউ খাওয়াতেন ঘুগনি। কেউ আবার ঠান্ডা পানীয়। তখনও ওবেসিটি এভাবে চোখ রাঙায়নি। একটু আধটু মিষ্টি খাওয়ায় ডাক্তারের



তেমন ফতোয়া ছিল না। এমন অনেক বাড়ি আছে, সারা বছর যাওয়াই হয় না। কিন্তু এই একটি দিনে বিধা দ্বিধায় যাওয়া যেত। মাস্টার মশাইদের সঙ্গে নিয়মিত দেখা হয় না। যে ছাত্ররা বাইরে থাকে, তারাও পুজোয় বাড়িতে এসে দশমীর দিন ঠিক হাজির হয়ে যেত মাস্টার মশাইদের বাড়ি। ছাত্র–শিক্ষক সম্পর্ক যেন খুঁজে পেত সেই হারানো উষ্ণতা। শুধু বিজয়ার দিনেই এই প্রণাম সীমাবদ্ধ থাকত না। এর রেশ চলত বেশ কয়েকদিন ধরে।

শুধু কি তাই! বিজয়া মানেই একসঙ্গে অনেক পোস্ট কার্ড আর ইনল্যান্ড লেটার কিনে আনা। প্রিয়জনদের চিঠি লেখা। ছোটরা জানাত প্রণাম, বড়রা জানাতেন আশীর্বাদ। কেউ কেউ হয়তো সারা বছর কোনও চিঠিই লিখতেন না। কিন্তু বিজয়ার সময় একসঙ্গে এক ডজন চিঠি লিখে ফেলতেন।

কালের স্রোতে সব কোথায় যেন হারিয়ে গেল। সেই চিঠি লেখাও অতীত। আত্মীয়, প্রতিবেশীদের বাড়িতেও যাওয়াও অনেকটাই কমে এসেছে। এখন ডিজিটাল যুগ। হোয়াটসঅ্যাপে একটা ছবি সবাইকে শেয়ার করে দিলেই বিজয়ার শুভেচ্ছা জানানো হয়ে যাচ্ছে। ছোট–বড়, বন্ধু–শিক্ষক সবাইকেই এক বার্তা। সেই বার্তাও ধার করা। এক মিনিটেই কত চেনা–অচেনা মানুষকে গণহারে শুভেচ্ছা জানানো হয়ে গেল। প্রযুক্তি হয়তো গতি এনে দিল। দ্রুত শুভেচ্ছা পৌঁছেও দিল। কিন্তু এই শুভেচ্ছার মূল্য কতখানি। একেকজনের মোবাইলে দুশো, তিনশো মেসেজ জমে আছে। অনেকে খুলেও দেখেন না। জানেন, এর ভেতর যা আছে, তাতে কোনও আবেগ নেই, কোনও আন্তরিকতা নেই। এই শুভেচ্ছা মনকে ছুঁয়ে যায় না।

সবকিছুই বড় বেশি যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে। পুজোর ধুমধাম আছে। আড়ম্বর আছে। কিন্তু দেখনদারিটা যেন বড্ড বেশি। তেমনই বিজয়াও যেন প্রাণহীন, উষ্ণতাহীন একটা উপলক্ষ্য। ব্যস্ততা থাকবে। আগের মতো সেভাবে প্রথাপালনও হয়তো সম্ভব নয়। তবু এই একটি দিনে কিছু মানুষের কাছে কি পৌঁছোনো যায় না! একটি মেসেজের বদলে একটি আলিঙ্গন কি অনেক বেশি প্রাণের স্পর্শ এনে দেয় না!



ভাই ফোঁটাও পৌঁছে গেল রেস্টুরেন্টে

সঞ্জীব রায়

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কতকিছুই বদলে গেল। বদলে গেল ভাইফোঁটাও।

যে কোনও উৎসবে সেকাল-একালের তুলনা আসবে, সেটাই স্বাভাবিক। যাঁরা বয়সে প্রবীণ বা মাঝবয়সী, তাঁরা তাঁদের ফেলে আসা দিনের স্মৃতিচারণ করবেন। এই প্রজন্ম দিনটা কীভাবে কাটায়, সেই প্রসঙ্গ টেনে আনবেন। ফেলে আসা সময়টাই ভাল ছিল, এই জাতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন। মোটামুটি চেনা ছবি।

দুর্গাপুজো, বিজয়া, কালিপুজো সবকিছুতেই বদল এসেছে। বদল এসেছে ভাই ফোঁটাতেও। সবকিছুর মতো এখন ভাই ফোঁটাও যেন রেডিমেড। একটা সময় ভাই



ফোঁটা মানে সকাল থেকে যেন হইহই রব। পিসিরা ফোঁটা দিল বাবা-কাকাদের। আবার মায়ের কাছে ফোঁটা নিতে আসত মামারা। আর আমাদের প্রজন্ম বলতে মাসি, পিসি, কাকার মেয়েরাও ফোঁটা দিত।

তখন দোকানের মিষ্টির তেমন চল ছিল না। বাড়িতেই নানারকম মিষ্টি তৈরি হত। কেউ বানাতো নারকেল নাড়ু, কেউ হয়তো গুড়ের মিষ্টি, কেউ পায়েস। আর সকালের দিকের মেনুতে থাকত লুচি, ঘুগনি। দুপুরের দিকে মাংস ভাত। তখন মাংস বলতে কিন্তু চিকেন বোঝাত না। চিকেন বাঙালির হেঁসেলে ঢুকেছে অনেক পরে। তখন মাটনও বলা হত না। আমরা বলতাম, খাসি মাংস, ভাত। সারা দিনটা কেমন একটা উৎসব উৎসব পরিবেশ। এখন সেই যৌথ পরিবারও নেই। আগের মতো সেই উদ্যমও নেই। এখন ছেলেরা কোনওরকমে টুয়েলভের গন্ডি পেরোলেই চলে যাচ্ছে বাইরে। মাসতুতো ভাই, পিসতুতো ভাইদের দেখা নেই। তাছাড়া, যদিও বা ভাই ফোটা হল, ছবি তোলার হিড়িকটা বড় বেশি। এখন তো অনেকের শুনেছি রেস্টুরেন্টেই ভাই ফোঁটা হয়। সেখানেই খাওয়া দাওয়া হয়ে যায়। ভাই ফোঁটা উপলক্ষ্যে বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে এখন এলাহি আয়োজন। নানা রকম প্যাকেজ।

সবকিছুই কেমন যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে। বাড়ির ভাইফোঁটা পৌঁছে গেল রেস্টুরেন্টে। এতখানি বদল বোধ হয় কাম্য ছিল না।



কে শমীক ভট্‌চাজ? তাঁর সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই

অজয় কুমার

ইদানীং শমীক ভট্টাচার্য কিছু বললেই নানা রকম মিম শুরু হয়ে যাচ্ছে। বামেরাও কটাক্ষ করছেন। তৃণমূল পন্থীরাও কটাক্ষ করছেন। সম্ভবত বিজেপি পন্থীরাও তাই করছেন।

অথচ, কয়েক মাস আগেও শমীকবাবু কিছু একটা বললে, বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই সবাই শুনতেন। মনে হত, এই মানুষটার পেটে বিদ্যে আছে। এই মানুষটা শিক্ষত, ভদ্র, মার্জিত। এই মানুষটা কখনও খারাপ কথা বলেন না। মনে হত, রাজনীতিতে এমন মার্জিত রুচির মানুষেরই থাকা উচিত।

কিন্তু মাত্র কয়েক মাসেই ছবিটা এমন বদলে গেল কেন? এখন তিনি কিছু বললে কেউ আর সিরিয়াসলি নিচ্ছে না কেন? তাঁর নির্দেশকে এমন অন্তঃসারশূন্য মনে হচ্ছে কেন? আমাদের প্রত্যাশা কি কোথাও ধাক্কা

খেল? নাকি শমীকবাবু নিজেই নিজেকে এমন জায়গায় এনে ফেললেন!

শমীকবাবু জননেতা নন। তিনি নিজে সেটা সবথেকে ভাল জানেন। একদিকে তিনি যেমন দলের অনুগত, অন্যদিকে বিরুদ্ধ মতকে সম্মান জানানোর শিষ্টাচারও আছে পুরোমাত্রায়। এতদিন এই দুটোর মধ্যে ভারসাম্য রেখে চলতে সমস্যা হয়নি। এখনও তিনি সৌজন্য ও শিষ্টাচারেই বিশ্বাসী। কিন্তু তিনি বিশ্বাসী হলে কী হবে, উল্টো মতের লোকেরা যে পাল্লায় ভারী। তাঁরা অন্য দল থেকে এসে ভিড় করছেন। বিজেপি নেতাদের থেকেও বেশি করে উগ্র হিন্দুত্বের প্রচার করে চলেছেন। দলের মধ্যে নম্বর বাড়াতে যে যার মতো করে ঘৃণা ছড়িয়ে চলেছেন। তাতে হাততালি পাওয়া যায়, মিডিয়ার শিরোনাম পাওয়া যায়, চর্চায় ভেসে থাকা যায়। সেখানে শমীকবাবুদের কণ্ঠস্বরকে কেমন যেন বেমানান মনে হয়।

আসলে, এই তৎকাল বিজেপিদের অনেককিছু প্রমাণের দায় আছে। তাঁদের প্রতিনিয়ত প্রমাণ করতে হচ্ছে, তাঁরা আরও বেশি 'হিন্দুত্ববাদি'। তাঁরা আরও ভাল করে ঘৃণা ছড়াতে পারেন। একা শমীকবাবু আর কত লড়াই করবেন?



কত শুদ্ধতার বার্তা দেবেন?

কোথাও কোনও অঘটন ঘটলেই তাঁকে বলতে হচ্ছে, 'যারা এসব করেছে, তাদের সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই। বিজেপি এই জাতীয় কাজকে সমর্থন করে না।' গত ছয় মাসে তিনি এতবার এইসব কথা বলে ফেলেছেন, এখন আর নতুন মনে হয় না। এখন সেই আশ্বাসবাণীটাই একটা রুটিনে বদলে গেছে। সেই আশ্বাসবাণীতে এখন ভরসার উপাদান কম, উপহাসের উপাদান বেশি।

কোনদিন এই বীরপুঙ্গবরা বলে বসবেন, 'কে শমীক ভট্চাজ! তাঁর সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই।' সেই দিন হয়তো খুব দূরে নেই।

স্বপনের নম্রতাই আসল সাহসিকতা

সৃজন শীল



পুজো জুড়ে কী তাণ্ডবলীলাটাই না চলল! পুজোর আবহে রাজনীতির তরজা সাধারণত মুলতুবি থাকে। বড়জোর, রাজনীতিকরা কে কোথায় আঞ্জলি দিচ্ছেন, কে কীভাবে জনসংযোগ করছেন, কে কী পোশাক পরছেন, এইসব উঠে আসত। রঙবেরঙের পোশাক পরে চ্যানেলে চলত আড্ডার আসর। কেউ গান গাইতেন, কেউ গিটার বাজাতেন, কেউ ছোটবেলার পুজোর স্মৃতি রোমন্থন করতেন।

কিন্তু সেসবকে ছাপিয়ে সংবাদ শিরোনামে এবার উঠে এল, আজ সকালে কোথায় স্টল ভাঙা হল, বিকেলে কোথায়। কোথাও সনাতনী নামধারী ওই বীরপুঙ্গবরা একের পর এক স্টল ভেঙে গেল। কোথাও গুটখা খেতে খেতে কোনও উজবুক সনাতনী পুজো নিয়ে ভাষণ দিচ্ছেন। কোথাও পুলিশ এসে নোটিশ ধরাচ্ছেন, কোথাও স্টল ভাঙতে বুলডোজার চলে এল! এই সব তরজা নিয়েই মেতে রইল চ্যানেলগুলি। মেতে রইল সোশ্যাল মিডিয়া।

চারদিনের নানা সার্কাস দেখে মনে হল, পুজোয় বামপন্থীদের বইয়ের স্টল ভাঙাই প্রশাসনের অগ্রাধিকার। সব স্টল থাকবে, শুধু বইয়ের স্টল থাকবে না। কী আজব এক ফতোয়া। এরই মাঝে তিনটি ভিন্ন কণ্ঠস্বর। তিনটিই এল শাসক শিবির থেকে। একজন শমীক ভট্টাচার্য। একজন অর্থমন্ত্রী স্বপন

দাশগুপ্ত। একজন আরএসএসের জিষ্ণু বসু।

এই তিনজন দ্বর্থ্যহীন ভাষাতেই বইয়ের স্টল ভাঙার বিরোধিতা করলেন। কেউ বললেন, এটা কখনই আমাদের সংস্কৃতি নয়। কেউ বললেন, যা হয়েছে, লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। তাঁরা যতই এই ঘৃণ্য ঘটনার নিন্দা করুন, দলের নিচুতলা পর্যন্ত এই বার্তা পৌঁছলোই না। বা বলা ভাল, নিচু তলার ওই বীরপুঙ্গবরা তাঁদের কথাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনলেন না।

এই তিনজনকে নিয়ে নানা বিদ্রুপ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। এই তিনজন আগে থেকে কেন বুঝতে পারেননি, কেন আটকাতে পারেননি, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এই সময়ে দাঁড়িয়ে এই ঘটনার নিন্দা করাটাও যে বেশ সাহসিকতার পরিচয়, সেটাও বুঝতে হবে। বিরোধী হয়ে সমালোচনা করা অনেক সহজ। কিন্তু শাসকের অংশ হয়ে এই ঘটনাকে ধিক্কার দিতে গেলে বুকের পাটা লাগে বইকি! স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী স্টল বসতে না দেওয়ার হুঙ্কার দিচ্ছেন, স্টল ভাঙতে প্রশাসনকে কার্যত লেলিয়ে দিচ্ছেন, একদল স্বঘোষিত সনাতনী প্রবল উৎসাহে স্টল ভাঙতে নেমে পড়েছে। একের পর এক বই আছাড় মারছে। এই অবস্থায় সরকারের মন্ত্রী হয়ে এই ‘প্রশাসনিক গুন্ডামি’র বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়।

স্বপন দাশগুপ্ত হয়তো তাঁর স্বভাবসুলভ মার্জিত ভঙ্গিতে বলেছেন। কিন্তু এই নরম কণ্ঠস্বরের মধ্যেও দৃঢ়তা কোনও অংশে কম ছিল না। তিনি খুব ভাল করেই জানেন, এই গুন্ডাদের বিরুদ্ধে বলা মানে, কার্যত মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বলা। তিনি খুব ভাল করেই জানেন, মুখ্যমন্ত্রীর উস্কানি না থাকলে এই গুন্ডাদের সাহস হত না স্টলে এসে ভাঙচুর করার। তিনি খুব ভাল করেই জানেন, প্রশাসনের সর্বোচ্চ জায়গা থেকে নির্দেশ না এলে এভাবে বুলডোজার বা ময়লা ফেলার গাড়ি আনা সম্ভব ছিল না। তারপরেও তিনি সোচ্চার হয়েছেন।

আর দশজনের মতো তিনিও চুপ করে থাকতেই পারতেন। আবোল তাবোল চারটে তাত্ত্বিক কথা বলে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দিতেই পারতেন। কিন্তু তিনি রাজধর্মই পালন করেছেন। স্বপন দাশগুপ্ত, আপনার সাহসিকতাকে কুর্নিশ না জানিয়ে উপায় নেই। বুঝিয়ে দিলেন, নম্র স্বরেও সাহসিকতা লুকিয়ে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী যতই দু’বাহু তুলে আস্ফালন দেখিয়ে থাকুন, পুলিশের বলে বলীয়ান হয়ে যতই হুমকি দিন, বোঝাই যাচ্ছে, স্নায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। চিৎকার বা আস্ফালন কখনই সাহসিকতার মানদণ্ড নয়। ভীরুরাই বেশি জোরে চিৎকার করে। এই মন্ত্রিসভায় সাহসী যদি কেউ থেকে থাকেন, তিনি স্বপন দাশগুপ্ত। অন্তত পুজোর চারটে দিনে এই সত্যিটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল।



বইমেলার আঙিনায় তিনিও কিন্তু অবাঞ্ছিত

স্বরূপ গোস্বামী

তিনি একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন। সিপিএমের লোকেরা তাবিজ পরে না। মাদুলি পরে না। হাতে সুতো বাঁধে না। একেবারে যাচ্ছেতাই।

শুধু তাই নয়। পুজোর সময় গেরুয়া ধুতি পরে না। খোল বাজায় না। সনাতনী সনাতনী বলে চিৎকার করে না। একেবারে ম্লেচ্ছ বলতে যা বোঝায়, তাই।

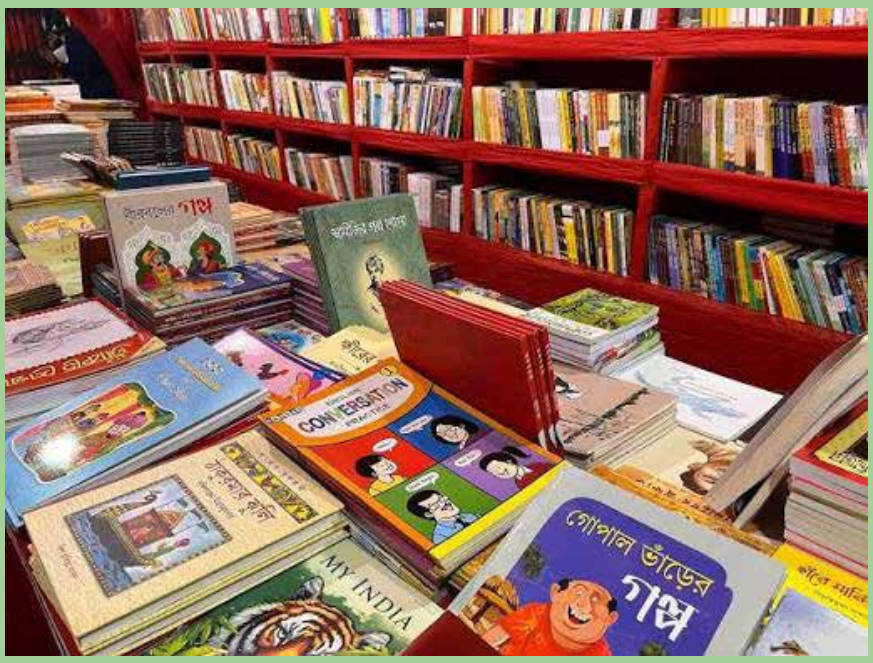
তিনি কিন্তু আদর্শ সনাতনী। কী সুন্দর খোল কত্তাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কী সুন্দর গেরুয়া পাঞ্জাবি পরেন। কী সুন্দর গেরুয়া কার্পেটে জুতো পরে হেঁটে যান। কী সুন্দর নাঙ্গা সাধুদের নিয়ে মিছিল করে ইউনিভার্সিটি ঘেরাও করেন। তাঁর মতো 'ধর্মপ্রাণ' মানুষ কটা আছে!



পুজোর বহু আগেই তিনি হুঙ্কার দিয়ে বসেছিলেন, পুজো মণ্ডপে এবার বামপন্থীদের বইয়ের স্টল হবে না। ওই বইয়ের স্টলে দেশদ্রোহী বই থাকে। জিহাদি বই থাকে। ওইসব বই পড়তে দেওয়া যাবে না।

কর্তা ধরে আনতে বললে পারিষদরা বেঁধে আনে, এটাই আবহমান কালের রেওয়াজ। তিনি হুঙ্কার দিলেন। বাকিরাও প্রবল উৎসাহে নেমে পড়লেন স্টল ভেঙে ফেলতে। তিনি তো শুধু উড়ে এসে জুড়ে বসা বিজেপি নন। প্রশাসনিক প্রধান বলে কথা। তিনি খোদ বিধানসভায় দাঁড়িয়ে হুঙ্কার দিয়েছেন। অতএব, তাঁর কথাই আইন। সুতরাং, আইনের রক্ষকরাও নেমে পড়লেন। স্টলে স্টলে এসে 'ভদ্রভাবে' স্টল সরিয়ে নিতে বললেন। অন্য কারও অনুমতি থাকুক আর নাই থাকুক, বইয়ের স্টলের অনুমতি থাকতেই হবে। যদি অনুমতি থাকে! তাহলে বলা হবে, এই অনুমতি প্রত্যাহার করে নেওয়া হল। বলা হবে, এই কাগজটা আছে, কিন্তু ওই কাগজটা নেই। পুজো মণ্ডপের ফায়ার লাইসেন্স থাকুক আর না থাকুক, বলা হবে বইয়ের স্টলের ফায়ার লাইসেন্স কই? মহান আত্মার মহানুভবতার অভাব হয় না।

সত্যিই তো, পুজোয় শুধু সনাতনীরা থাকবে। এখানে বইয়ের স্টল কেন থাকবে? কে এত পড়তে বলেছে? তাগা, তাবিজ পরো, কীর্তন করো, কথায় কথায় জয় শ্রী রাম বলো। রামের মায়ের নাম জানো না? ওসব না জানলেও চলবে। লোকে না বলুক, নিজেই নিজেকে সনাতনী ঘোষণা করে



দাও। তাহলেই সাতখুন মাপ।

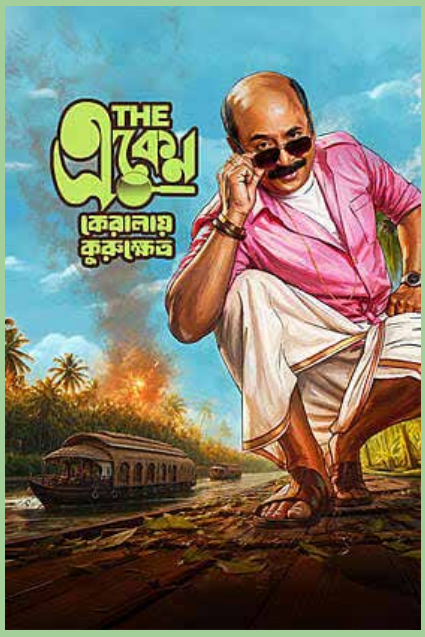
ঠিক করেছেন মশাই। বইয়ের স্টল ভেঙে ভালই করেছেন। ওসব না বসতে দেওয়াই ভাল। ওটা সিপিএমের জায়গা নয়।

বিনীতভাবে এবার একটা কথা না বললেই নয়। যদি অভয় দেন তো বলতে পারি। ধর্মের সঙ্গে সিপিএমের সম্পর্ক নেই। মণ্ডপে ওদের স্টল না থাকাই ভাল।

সিপিএমের ধর্মে মতি না থাকলেও তারা অন্তত মন্দির বা মূর্তি ভাঙতে যাননি। কিন্তু আপনারা তো আরেক ধাপ উপরে। স্টলে ভাঙচুর চালালেন। বই পা দিয়ে মাড়ালেন। এই কদিনে আপনি এবং আপনার বীরপুঙ্গবরা বুঝিয়ে দিলেন, বইয়ের সঙ্গে আপনাদেরও তেমন সম্পর্ক নেই। বইয়ের সম্পর্কে কোনও শ্রদ্ধাও নেই।

দোহাই, বইমেলার আঙিনা থেকে আপনারাও দূরে থাকুন। সুন্দর বইমেলার অঙ্গন যেন আপনার উপস্থিতিতে কলুষিত না হয়। আপনি যত খুশি খোল বাজান, কীত্তন করুন। ওটাই আপনাকে মানায়। যে প্রশাসক বইয়ের স্টল ভাঙায় ইন্ধন দেন, বইমেলায় তিনি সত্যিই অবাঞ্ছিত।

এত থ্রিলারের ভিড়! একেনবাবুকে রেহাই দিন



স্নেহা সেন

একেনবাবু যাচ্ছেন কেরলে। বেনারস, শান্তিনিকেতন, দার্জিলিং, পুরী, রাজস্থান ঘুরে এবার দক্ষিণ ভারতের এই সবুজ, সুন্দর রাজ্য। সঙ্গে সেই চেনা দুই সঙ্গী বাপি আর প্রমথ। কিন্তু এবারের অভিযান আর পাঁচটা রহস্য সমাধানের গল্প নয়। এখানে রহস্যের সঙ্গে মিশেছে সন্ত্রাসবাদ, বিজ্ঞান, বিপজ্জনক ষড়যন্ত্র আর টানটান অ্যাকশন।

কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়। একেনবাবুর মতো নরম-সরম, নিরীহ, খানিকটা হাবাগোবা গোছের মানুষটিকে দিয়ে এত মারকাটারি থ্রিলার করানোর দরকার ছিল কি? যিনি ভুলভাল প্রবাদ বলেন, কথায় কথায় খাবারের খোঁজ করেন, আর তাঁর আপাত বোকামির আড়ালেই লুকিয়ে থাকে তুখোড় গোয়েন্দার মস্তিষ্ক, তাঁকে যখন প্রায় অ্যাকশন হিরোর মেজাজে হাজির করা হয়, তখন একটু ধাক্কা লাগে বইকি!

একেনবাবুর জনপ্রিয়তার শুরু ওটিটিতে। সুজন দাশগুপ্তের সৃষ্ট এই গোয়েন্দা চরিত্রকে নিজের মতো করে গড়ে তুলেছেন অনির্বাণ চক্রবর্তী। তাঁর কথা বলার ধরন, মুখের অভিব্যক্তি, অদ্ভুত যুক্তি আর ভুলভাল প্রবাদ—সব মিলিয়ে একেনবাবু যেন বাঙালির ঘরের লোক। সেই চরিত্রকে বড় পর্দায় নিয়ে আসার মধ্যে ঝুঁকি ছিল। কারণ, ওটিটিতে যে মাপের গল্প ও অভিনয় দর্শককে আনন্দ দেয়, সিনেমার পর্দায় তার সঙ্গে যোগ হয় আরও বড় প্রত্যাশা।

জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় ‘কেরালায় কুরুক্ষেত্র’ সেই প্রত্যাশা পূরণের চেষ্টা করেছে।



পুরুলিয়ার অভিযান শেষ হওয়ার পর অপহৃত একেনবাবুকে দেখা যায় কেরলে। সেখানে নিখোঁজ বিজ্ঞানী মিহির সেন, এক বিপজ্জনক সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী এবং এক গোপন অভিযানের সূত্র ধরে জটিল হয়ে ওঠে রহস্য। একেনকে সাহায্য করতে গিয়ে বাপি আর প্রমথও জড়িয়ে পড়ে সেই বিপদের মধ্যে।

গল্পের শুরু থেকেই গতি আছে। একের পর এক প্রশ্ন তৈরি হয়। কেন এই অপহরণ? বিজ্ঞানীর কাছে কী এমন তথ্য রয়েছে? আর গোটা ঘটনার সঙ্গে একেনবাবুরই বা সম্পর্ক কী? রহস্যের জট খুলতে গিয়ে দর্শককে মন দিয়ে ছবি দেখতে হয়। তবে কিছু জায়গায় কাহিনির জটিলতা একটু বেশি মনে হতে পারে। সব প্রশ্নের উত্তরও সমান জোরালো নয়।

এই ছবির সবচেয়ে বড় সম্পদ অনির্বাণ চক্রবর্তী। একেনবাবু আর অনির্বাণকে আলাদা করে ভাবা এখন প্রায় অসম্ভব। দু'জন যেন একে অন্যের পরিপূরক। অনির্বাণ চরিত্রটিকে এমনভাবে আত্মস্থ করেছেন যে তাঁর সামান্য চোখের চাহনি কিংবা কথার ফাঁকে ফাঁকে তৈরি হওয়া হাসিটুকুও দর্শককে আনন্দ দেয়।

এবার অবশ্য তাঁকে নতুন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছে। শুধু বুদ্ধির জোরে রহস্যের সমাধান নয়, বিপদের সামনে দাঁড়িয়ে সক্রিয় ভূমিকাও নিতে হচ্ছে। এই পরিবর্তন তাঁর অভিনয়ের নতুন দিক দেখায়। তবে এখানেই নির্মাতাদের একটু সাবধান হওয়া দরকার। একেনবাবুর শক্তি তাঁর সাধারণত্বের মধ্যে। তাঁকে পুরোপুরি অ্যাকশন হিরো বানিয়ে ফেললে চরিত্রটির নিজস্ব আকর্ষণটাই হারিয়ে যেতে পারে।



বাপি ও প্রমথের ভূমিকায় সুহোত্র মুখোপাধ্যায় এবং সোমক ঘোষ যথাযথ সঙ্গত দিয়েছেন। তিনজনের পারস্পরিক রসায়ন ছবির হাস্যরসের বড় উৎস। অন্যদিকে, ইরফান ফাজিলের চরিত্রে ঋত্বিক চক্রবর্তী ছবিতে বিপদের আবহ তৈরি করেছেন। তাঁর অভিনয়ে সংযম আছে, যদিও কিছু জায়গায় চরিত্রটির আরও গভীরতা প্রত্যাশিত ছিল। রাইমা সেনের চরিত্রটিও আরও বিস্তৃত হলে ভালো লাগত।

কেরলের প্রকৃতি এই ছবির অন্যতম আকর্ষণ। কোচি, আলেপ্পির জলপথ, পেরিয়ার নদীর তীর কিংবা মুন্নারের জলপ্রপাত—বিভিন্ন জায়গার দৃশ্য ছবিকে অন্য মাত্রা দিয়েছে। টুবানের ক্যামেরায় প্রকৃতির সৌন্দর্য ধরা পড়েছে। তবে এই সৌন্দর্য কেবল চোখের আরাম জোগায় না, অভিযানের পরিসরকেও বড় করে তোলে। অ্যাকশন, রহস্য আর হাস্যরসের মধ্যে ভারসাম্য রাখার চেষ্টাও প্রশংসনীয়।

তা হলে সব মিলিয়ে ছবিটি কেমন? নিখুঁত নয়, কিন্তু উপভোগ্য। গল্পের কিছু দুর্বলতা আছে, কিছু চরিত্র আরও যত্ন দাবি করে। অ্যাকশনের বাড়াবাড়ি নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায়। তবু একেনবাবুর চেনা মেজাজ পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। তাঁর বুদ্ধি, বোকামির অভিনয় আর বাপি-প্রমথের সঙ্গে খুনসুটি ছবিটিকে ধরে রেখেছে।

তবে শেষ প্রশ্নটা থেকেই যায়—পথিক, তুমি কি পথ হারায়েছো? একেনবাবু কি তাঁর চেনা পথ ছেড়ে অন্য পথে হাঁটছেন? উত্তরটা পুরোপুরি নেতিবাচক নয়। নতুন কিছু করার চেষ্টা জরুরি। কিন্তু নতুনত্বের নামে চরিত্রের স্বাভাবিকত্ব বিসর্জন দেওয়া উচিত নয়। একেনবাবুকে বড় পর্দায় আরও বড় করে তোলা যেতেই পারে, তবে তাঁর সরলতা আর অদ্ভুত যুক্তিবোধকে সঙ্গে নিয়েই।

কারণ, একেনবাবু শুধু রহস্য সমাধান করেন না, রহস্যের মধ্যে হাসতে শেখান। সেই হাসিটুকুই যেন অ্যাকশনের শব্দে চাপা না পড়ে।



নিজস্বতা আনতে গিয়েই ব্যুমেরাং হয়ে গেল

বিপ্লব মিশ্র

নাটক থেকে সিনেমা বা সিনেমা থেকে নাটক। কোনওটাই নতুন নয়। সংস্কৃতির আঙিনায় এমন রূপান্তর হামেশাই চলে। একটা আঙ্গিকের সঙ্গে অন্য আঙ্গিকের তফাত থাকবে, সেটাই স্বাভাবিক। আমরা চাই বা না চাই, পারস্পরিক একটা তুলনাও এসেই যায়।

সৃজিত মুখার্জি যখনই ঘোষণা করেছিলেন, তিনি উইঙ্কল টুইঙ্কল নিয়ে ছবি বানাবেন, তখন থেকেই যেন অদৃশ্য একটা তুলনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। যাঁরা নাটকটি দেখেননি, তাঁদের কাছে দুই ঘরানার এই তুলনা নাও আসতে পারে। কিন্তু যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা চাইলেও তুলনা আটকাতে পারবেন না। মনে মনে তুলনা আসবেই।



নেই, সেটা বোঝা যায়। কারণ, আমি যতবার দেখেছি, সরকারি হলেই দেখেছি। অধিকাংশ সময়েই অ্যাকাডেমিতে দেখেছি। সেই নাটক নিয়ে দারুণ আলোড়ন ও বিতর্ক হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু প্রদর্শন বন্ধ হয়েছে, এমনটা স্বয়ং নাট্যকারও কোনওদিন অভিযোগ করেননি।

আমি কবার উইঙ্কল টুইঙ্কল দেখেছি, মনে করা একটু কঠিন। অন্তত সাত–আটবার তো হবেই। বছর খানেক আগে যখন দেখলাম ইউটিউবেও এই নাটক আপলোড করা হয়েছে, তখন আরও দুবার পুরনো স্মৃতিকে ঝালিয়ে নিয়েছি। আসলে, এতবার শুধু নিজে দেখব বলে দেখিনি। ভাল নাটক বা ভাল সিনেমা আরও কাউকে দেখানোর একটা বাড়তি তৃপ্তি আছে। তাই অনেক বন্ধু বা পরিচিত লোকেদেরই নানারকম নাটক দেখতে নিয়ে গেছি। সেই সুবাদে অনেক নাটক আমারও বেশ কয়েকবার দেখা হয়েছে।

মাঝে মাঝেই শোনা যায়, বাম জমানায় এই নাটক নাকি সরকারি হলে চলতে দেওয়া হয়নি। যাঁরা বলেন, নাটকের সঙ্গে তাঁদের যে দূরদূরান্তের কোনও সম্পর্ক যাই হোক, ফিল্ম রিভিউ লিখতে বসে এত পুরনো কথা টেনে আনার দরকার নেই। মোদ্দা কথা, এই ছবিটা কতটা প্রত্যাশা মেটাল? পরিচালকের বিচক্ষণতার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও বলতে হচ্ছে, অনেক ফাঁক ও ফাঁকি থেকে গেল। নাটকটা ২০০২ এর পটভূমিতে লেখা। নাটক হিসেবে যখন মুক্তি পেয়েছিল, তখন প্রাসঙ্গিক ছিল। এত বছর পর সেই ঘটনাক্রমকে নির্মাণ করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ তো বটেই। ২০০২ এর বাস্তবতা এই প্রজন্মকে বোঝানো কঠিন। এমনকী যাঁরা পঞ্চাশ অতিক্রান্ত, তাঁদেরও তাল মেলাতে সমস্যা হওয়ারই কথা। সেই সময়ের বাস্তবতাকে পর্দায় তুলে ধরতে গিয়ে স্বয়ং পরিচালকই অনেক ঘটনাক্রমকে গুলিয়ে ফেলেছেন। ২০০২ এ মোটেই পরিবর্তনের ঝড় ছিল না। ২০০১ দুশোর বেশি আসন নিয়ে





বামেরা যেমন দারুণ শক্তিশালী ছিল, তেমনই সেই নির্বাচনে হারের পর তৃণমূল একেবারেই মূহ্যমান হয়ে পড়ে। যে কারণে ২০০৪ এর লোকসভায় একমাত্র মমতা ব্যানার্জি ছাড়া আর কেউ জিততে পারেননি। তাই ২০০২ এ পরিবর্তনের ঝড়টা একটু যেন বাড়াবাড়ি।

ঠিক যেমন, ২৬ বছর পর জনজীবনে ফিরে আসা নায়ককে বাম বোঝাতে গিয়ে যত্রতত্র লাল রঙের ব্যবহার। সাইড ব্যাগের রঙ লাল। স্ত্রীর পরণে লাল শাড়ি। লাল রঙের এমন উৎকট ব্যবহার বেশ দৃষ্টিকটূ। গানের ব্যবহারও বেশ বেমানান। এমন এমন দৃশ্যে গান ব্যবহার করা হয়েছে, যার ফলে ছবির গতি বারবার হোঁচট খেয়েছে।

ছবির কাহিনি অনেকেরই জানা। তবু যাঁরা জানেন না, তাঁদের জন্য নির্যাস হল, ২৬ বছর ঘুমিয়ে থাকার পর সব্যসাচী সেনের ঘুম ভেঙেছে। জরুরি অবস্থার সময় তাঁকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। ঘুম ভেঙে তিনি দেখছেন, রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে। জ্যোতি বসুর পর্ব পেরিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। দেওয়ালে মমতা ব্যানার্জি নামক এক নেত্রীর উদয়। তৃণমূল কংগ্রেস নামক নতুন দলের আবির্ভাব। বাড়ি ফিরে জানতে পারলেন, তাঁর ছেলে নাকি সেই তৃণমূলের কর্মী। চারপাশের সবকিছু কেমন যেন বদলে গেছে। আদর্শে অবিচল মানুষটি বদলে যাওয়া সময়ের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারেন না।

সৃজিতের ছবিতে বিকল্প ভাবনার একটা



ছাপ থাকে। যথেষ্ট পড়াশোনা ও রিসার্চ ওয়ার্ক থাকে। এখানেও তিনি নাটককে কপি পেস্ট করেননি। নিজস্বতা মেশাতে চেয়েছেন। কিন্তু নিজস্বতা আনতে গিয়ে অহেতুক কিছু দুর্বোধ্য সংলাপের আমদানি করেছেন। খুব বেশি ইতিহাস মনস্ক ও রাজনীতি মনস্ক না হলে এই সংলাপগুলো বোয়িং বিমানের মতো মাথার উপর দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

নাটকে পিতা-পুত্রের চরিত্রে ছিলেন দেবশঙ্কর হালদার, রজতাভ দত্ত। আর সিনেমায় এই দুই ভূমিকায় ঋত্বিক চক্রবর্তী, পরমব্রত চ্যাটার্জি। তাঁদের অভিনয় নিয়ে প্রশ্ন নেই। দুজনেই জাত অভিনেতা। নিজেদের যথাসম্ভব মেলে ধরেছেন। বিশেষ করে ঋত্বিক তো অনবদ্য। স্ত্রীর ভূমিকায় অনসূয়া মজুমদারও বেশ মানানসই। তবু মানতেই হবে, ব্রাত্য বসু যেভাবে দর্শকের মনকে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন, সৃজিত সেই হিসেবে অনেকটাই পিছিয়ে। এমন সব বিষয়কে টেনে এনেছেন যা সেই সময়ে আলোচ্য ছিল না। এমন এমন শব্দের আবির্ভাব হয়েছে, যে শব্দগুলো সেই সময়ের রাজনীতিতে ঘোরাফেরা করত না। যেমন 'হার্মাদ' শব্দটার বহুল ব্যবহার মোটামুটি নন্দীগ্রাম পর্ব থেকে। সময়টা ২০০৭-০৮ হবে। ২০০২ সালে বিরোধীদের মুখে 'হার্মাদ' কথাটা শুনেছি বলে মনে পড়ছে না। এমনই অনেক শব্দ বা বাক্য আছে যেগুলো সেই সময়ের বাস্তবতায় খাপ খায় না। কৃষি বনাম শিল্পের বিতর্কও জোর করে ২০০২ সালে এনে ফেলা হয়েছে।

ছবিটা হলে দেখার সুযোগ হয়নি। দেখতে হয়েছে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে। রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে ব্রাত্য বসু কার্যত স্বেচ্ছা নির্বাসনে। নিজেকে যতটা সম্ভব গুটিয়ে রেখেছেন। এই নাটকটা ব্রাত্য বসু লিখেছিলেন পঁচিশ বছর আগে। ভাবতে ভাল লাগছে, পঁচিশ বছর আগে তিনি কী পরিণত একটা নাটক উপহার দিয়েছিলেন। সিনেমাটা দেখতে দেখতে বারবার সেই নাট্যকারের মুখটাই ভেসে উঠছিল। মন্ত্রী ব্রাত্য বসু হারতেই পারেন, কিন্তু নাট্যকার ব্রাত্য বসু এত সহজে হারিয়ে যাওয়ার মানুষ নন। বহু বছর পরেও থেকে যাবেন, স্বমহিমায়।



পঞ্চায়েতের মতোই, গ্রাম চেনার সহজ পাঠ

বিপ্লব মিশ্র

গ্রামের হাসপাতাল। নামেই হাসপাতাল। দরজা আছে, জানলা আছে, ডাক্তার আছেন। হয়তো একটা স্টেথোস্কোপও আছে। নেই শুধু রোগী। হাসপাতালের উঠোনে রোগীর ভিড়ের বদলে আগাছা মাথা তোলে। ওষুধ আছে কি না জানা নেই, কিন্তু মানুষের বিশ্বাস নেই। শহর থেকে আসা ডাক্তারটি প্রথম দিনেই বুঝে যান—এখানে তাঁর সবচেয়ে বড় কাজ প্রেসক্রিপশন লেখা নয়। মানুষকে হাসপাতালে ফিরিয়ে আনা।

এই জায়গা থেকেই শুরু ‘গ্রাম চিকিৎসালয়’। TVF-এর তৈরি এই হিন্দি ওয়েব সিরিজের গল্প ভাটকান্ডি গ্রামের প্রায় এক পরিত্যক্ত এক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ঘিরে। শহুরে মেডিক্যাল শিক্ষায় তৈরি তরুণ ডাক্তার প্রভাত সিংহ এখানে এসে যেন অন্য এক ভারতের মুখোমুখি হন। এখানে রোগী চিকিৎসকের কাছে আসে না। চিকিৎসককেই পৌঁছতে হয় রোগীর কাছে। আর সেই পথ শুধু মাটির রাস্তা দিয়ে তৈরি নয়—তার



মধ্যে মিশে থাকে কুসংস্কার, অভ্যাস, দারিদ্র্য, অবিশ্বাস, স্থানীয় রাজনীতি এবং বহু বছরের জমে থাকা ক্ষত।

ডাঃ প্রভাতের ভূমিকায় আমোল পরাশর। চরিত্রটির মধ্যে কোনও নায়কোচিত আড়ম্বর নেই। বরং আছে বিরক্তি, অসহায়তা, ভুল করা, আবার উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা। প্রথম দিকে তাঁর মনে হয়, তিনি যেন ভুল জায়গায় এসে পড়েছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে ভাটকান্ডির মানুষ তাঁর কাছে 'কেস' নয়, মানুষ হয়ে উঠতে শুরু করে। আর সেখানেই বদলে যায় প্রভাতও। এই বদলে যাওয়াটাই সিরিজটির প্রাণ।

অন্যান্য চরিত্রগুলিকেও ভাল আর মন্দর মোড়কে না ফেলাই ভাল। নানা রঙের মিশেল। ভালর মধ্যে মন্দ যেমন আছে, আবার মন্দের মধ্যে ভালর সন্ধানও আছে। হাতুড়ে চিকিৎসকের মধ্যেও যেমন মানুষের অসহায়তার সুযোগ নেওয়ার প্রবণতা আছে, তেমনই আছে মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার ক্ষমতা। সরকারি ব্যবস্থার মানুষটির মধ্যেও যেমন দায়িত্বহীনতা আছে, তেমনই আছে নিজের মতো করে কিছু করার চেষ্টা। এই ধূসর জায়গাটাই 'গ্রাম চিকিৎসালয়'-কে আলাদা করে।

কারণ সিরিজটি গ্রামকে সুন্দর করে দেখানোর চেষ্টা করেনি। এখানে সর্ষে-ফুলের ক্ষেত আছে, কিন্তু তার পাশেই আছে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অব্যবস্থা। এখানে মানুষ অতিথিপরায়ণ, আবার কুসংস্কারেও বিশ্বাসী। এখানে সম্পর্কের উষ্ণতা আছে, আবার জাতপাত, অর্থাভাব, শিক্ষার অভাবও আছে। অর্থাৎ গ্রাম কোনও ছবির পোস্টকার্ড নয়। গ্রামও একটি জীবন্ত সমাজ।

একজন মানুষ কেন সরকারি হাসপাতাল ছেড়ে হাতুড়ে চিকিৎসকের কাছে যায়? কেন হাসপাতালের বিছানা খালি পড়ে থাকে? কেন একজন ডাক্তারকে গ্রামের মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে হয়? কেন স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা তৈরি করাও চিকিৎসারই অংশ? প্রশ্ন উঠবে। উত্তর কোথাও স্পষ্ট, আবার কোথাও আবছা।

এই কারণেই 'গ্রাম চিকিৎসালয়'



দেখতে দেখতে কখনও হাসি পায়, কখনও মন খারাপ হয়। কখনও মনে হয়, আমরা শহরে বসে গ্রামের মানুষকে কত সহজে বিচার করি। অথচ তাদের জীবন, ভয়, অভিজ্ঞতা, বিশ্বাস—এসবের ভিতরে না ঢুকে তাদের সিদ্ধান্তের বিচার করা কত সহজ!

'পঞ্চায়েত'-এর মতোই এখানে গ্রাম আছে, কিন্তু এই গ্রামের দরজা দিয়ে ঢুকে পড়তে হয় আরও গভীরে। প্রশাসন নয়, এখানে আলোচনার কেন্দ্রে স্বাস্থ্য। হাসপাতাল নয়, আসলে আলোচনার কেন্দ্রে মানুষ। আর সেই মানুষগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে গিয়েই সিরিজটি একসময় নিছক বিনোদন থাকে না। শহরের মানুষ হিসেবে আমরা গ্রামের কথা বলি। গ্রামকে ভালোবাসার কথাও বলি। কিন্তু কতটা চিনি?

'গ্রাম চিকিৎসালয়' সেই চেনার সুযোগ দেয়। শেখায়, গ্রাম মানে শুধু সবুজ মাঠ নয়। গ্রাম মানে অসংখ্য মানুষের জীবন, হাসি-কান্না, ভয়, ভুল, অভিমান, বেঁচে থাকার লড়াই। সেই মানুষদের কাছে পৌঁছতে গেলে শুধু হাসপাতাল বানালেই হয় না, দরকার আস্থা।

সিরিজটি শেষ হয়ে গেলে তাই ভাটকান্ডিকে একটু মনে পড়ে। মনে হয়, কোথাও একটা ছোট্ট হাসপাতালের উঠোনে এখনও হয়তো আগাছা গজিয়ে আছে। হয়তো কোনও ডাক্তার বসে আছেন রোগীর অপেক্ষায়। আর দূরের কোনও গ্রাম থেকে একজন মানুষ ধীরে ধীরে সেই হাসপাতালের দিকে হাঁটছেন। সেই হাঁটাটুকুই হয়তো বদলের শুরু।

'গ্রাম চিকিৎসালয়' তাই শুধু একটি ওয়েব সিরিজ নয়। এটি শহর থেকে গ্রামের দিকে তাকানোর একটি জানলা। আর সেই জানলা দিয়ে একবার তাকালে—গ্রামকে হয়তো আর আগের মতো দেখা যায় না।



ধনতেরাসে কীসের এত আদিখ্যেতা?

সঞ্জয় সেন

বছরখানেক আগেও ধনতেরাস উৎসবের কথা শুনেছিলেন? পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন দেখেছিলেন? হিন্দি বলয়ের এই উৎসব কবে যেন বাংলার ড্রয়িংরুমে ঢুকে পড়েছে। টিভিতে ধনতেরাসের বিজ্ঞাপনের ছয়লাপ। কাগজে কাগজে পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন। এসব ঢাউস বিজ্ঞাপনের ফল যে পাওয়া যাচ্ছে, তা তো গয়নার দোকানের ভিড় দেখলেই বোঝা যায়।

অনেকদিন আগে একটা কথা শুনেছিলাম, যার ভেতরে কোনও অলঙ্কার নেই, তাকে বাইরের অলঙ্কার দিয়ে নিজেকে ঢেকে রাখতে হয়। অর্থাৎ, আরও সহজ ভাষায় বললে, অলঙ্কার হল মূর্খের অবলম্বন। সে দামী গয়না পরেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। এই রোগটি মহিলাদের একতরফা, এমন মনে করার কোনও কারণ নেই। অলঙ্কারধারী পুরুষেরও অভাব নেই। যত দিন যাচ্ছে, এই প্রবণতা বাড়ছে। পালাবদলের পর এর সঙ্গে আরও বেশি করে ধর্মীয় অনুষঙ্গ



জুড়ে যাবে, এটাও অজানা নয়। এই বছর যে হারে গণেশ পুজো হয়েছে, গণেশ নিজেই হয়তো সংশয়ে পড়ে যাবেন তিনি মহারাষ্ট্রের নাকি বাংলার। গণেশ পুজোও যে 'সর্বজনীন' হতে পারে, আমাদের জানাই ছিল না।

টিভিতে সিরিয়াল মানেই যেন অলঙ্কারের বিজ্ঞাপন। রান্নাঘরে রান্না করছে, গা ভর্তি গয়না। ড্রয়িংরুমে কুটকচালি করছে। সেখানে গয়না। পাঁচ মহিলা দাঁড়িয়ে ঝগড়া করছে, পাঁচজনের গায়েই দামি শাড়ি, পাঁচজনের পরণেই যেন বিয়েবাড়ির সাজ। সে ভোরের দৃশ্য হোক বা রাতের। সিনেমাতেও কায়দা করে পিসি চন্দ্র, অঞ্জলি জুয়েলার্স, বলরাম বসাক— এসব ঢুকে পড়ছে। কখনও দোকানের ছবিতে, কখনও নায়ক-নায়িকার সংলাপে। এভাবে বাঙালির অন্দরমহল না জেনে, না বুঝে গিলছে অলঙ্কারকে।

অনেকে রেগে যেতেই পারেন, কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যে যত অলঙ্কার পরে, তার কথায় বুদ্ধি-যুক্তির ছাপ তত কম। ভাবেন, গয়না পরলে বোধ হয় তাঁদের দারুণ সুন্দর লাগছে। পুরুষ বোধ হয় তাঁদের দিকে তাকিয়েই থাকবে। হ্যাঁ, গয়না দেখে তাকিয়ে থাকা পুরুষের অভাব নেই। স্থূল ও চটুল জিনিসের কদর করার লোক সবসময়ই বেশি।

বাঙালি নবান্ন, পিঠে পরব ভুলতে বসেছে। আঁকড়ে ধরছে ধনতেরাসকে। হুজুগপ্রিয়তার এমন উর্বর জমি, কে না চাষ করতে চাইবে? তাই গয়নার কোম্পানিগুলোও বাজার ধরতে লাফিয়ে পড়েছে। ধনতেরাস ধামাকার নামে আদেখলাপনাই বুঝিয়ে দেয় বাংলার হালফিলের ছবিটা আসলে কেমন।



এমন বিদায় কি সামির প্রাপ্য ছিল?

দেবায়ন কুণ্ডু

আবার সেই অবসর। আবার সেই ইনস্টাগ্রামে ঘোষণা। না কোনও ফেয়ারওয়েল ম্যাচ। না কোনও প্রেস কনফারেন্স। গত দু'বছরে বারবার এমন ঘটনা ঘটছে। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, চেতেশ্বর পুজারা, অজিঙ্ক রাহানে হয়ে সাম্প্রতিকতম উদাহরণ মহম্মদ সামি। যাঁদের উদাহরণ দেওয়া হল, এঁরা কেউই ভারতীয় ক্রিকেটে ক্ষণিকের অতিথি নন। কেউ খেলেছেন শতাধিক টেস্ট। কেউ আশির ওপর। প্রত্যেকেই প্রায় দেড় দশক ধরে ভারতের জার্সি গায়ে খেলেছেন। প্রশ্ন হল, এঁদের সঙ্গে বোর্ডের এত দূরত্ব তৈরি হচ্ছে কেন? ন্যূনতম সমন্বয়টুকু থাকছে না কেন? একবুক অভিমান নিয়ে কেন এঁদের সোশ্যাল মিডিয়ায় অবসর ঘোষণা করতে হচ্ছে?



কেউ ফর্মের শিখরে থাকতে থাকতে মাথা উঁচু করে স্বেচ্ছায় বিদায় নেন। কেউ চোটের কারণে ছিটকে যান। সেই চোট সারিয়ে আর ফেরা হয় না। কেউ খারাপ ফর্মের জন্য বাদ যান। একসময় হতাশ হয়ে অবসর নেন। এর কোনওটাই সামির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাঁর ফর্ম ও ধারাবাহিকতা নিয়ে কখনই প্রশ্ন ওঠেনি। যতদিন খেলেছেন, দলের অপরিহার্য বোলার হয়েই খেলেছেন। যশপ্রীত বুমরা ও তাঁর জুটি ভারতীয় বোলিংয়ের অন্যতম সম্পদ। এমন সফল জুটি ভারতীয় পেস বোলিংয়ে আর কটা এসেছে? ফর্মের জন্য তিনি মোটেই বাদ যাননি। চোটের জন্য বাইরে থাকতে হয়েছিল। বেঙ্গালুরুর রিহ্যাব সেন্টারে মাসের পর মাস পড়ে থেকেছেন। চোট সারিয়েছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে দু'বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে খেলে যাচ্ছেন। উইকেট নিচ্ছেন। লম্বা স্পেলে বোলিং করছেন। কিন্তু তারপরও তাঁর জন্য জাতীয় দলের দরজা খুলল না।

তিন বছর আগে দেশের মাটিতে হওয়া বিশ্বকাপের কথাই ধরুন। প্রথম চার ম্যাচে তাঁকে দলে রাখাই হয়নি। যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজদের সঙ্গে জোরে বল করতে দেখা যাচ্ছিল হার্দিক পান্ডিয়াকে। আচমকাই চোট পেয়ে বসলেন হার্দিক। কারও সর্বনাশ তো কারও পৌষ মাস। যে সামিকে এতদিন রিজার্ভ বেঞ্চে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হচ্ছিল, তিনি দলে ফিরেই পরের সাত ম্যাচে নিলেন ২৪ উইকেট। একটি বিশ্বকাপে এত উইকেট নেওয়ার কৃতিত্ব আর কোনও ভারতীয় বোলারেরই নেই। প্রথম চার ম্যাচে খেলানো হলে উইকেট সংখ্যা কোথায় গিয়ে পৌঁছতো! হয়তো তিরিশ ছাপিয়ে যেত। কিন্তু সবরমতীর তীরে এসেও যেন তরী ডুবল। ফলে, সামিকে ট্র্যাজিক হিরো হয়েই থেকে যেতে হল।

তার ঠিক চার বছর আগের কথাই ধরুন। ২০১৯ এ বিশ্বকাপের আসর বসেছিল ইংল্যান্ডে। সেবারও প্রথমদিকের ম্যাচগুলোতে সামিকে খেলানোই হয়নি। যখন সুযোগ এল, প্রথম ম্যাচেই হ্যাটট্রিক, পরের ম্যাচে পাঁচ উইকেট। তৃতীয় ম্যাচে



আবার চার উইকেট। অর্থাৎ পরপর তিন ম্যাচে নিয়েছিলেন ১৩ উইকেট। কিন্তু রহস্যজনক কারণে সেবার সেমিফাইনালে খেলানোই হয়নি এই জোরে বোলারকে। কিন্ত তাঁকে বাদ দেওয়া হলেও তোলপাড় হয় না, প্রশ্নের ঝড় ওঠে না। তাঁর দুরন্ত সাফল্যের পরেও তাঁকে নিয়ে মাতামাতি হয় না। হয়তো গা সওয়া হয়ে গেছে। দিন কয়েক আগে, কিছুটা অভিমান করেই বলেছিলেন, আগের বিশ্বকাপে আমি ৩ ম্যাচে ১৩ উইকেট নিয়েছিলাম। এবারও ৭ ম্যাচে নিয়েছি ২৪ উইকেট। একজন জোরে বোলারের কাছ থেকে এক থেকে বেশি আপনারা কী আশা করেন?

অনেক ঝড়ঝাপটা বয়ে গেছে তাঁর জীবনের ওপর দিয়ে। নিজেকে যতটা সম্ভব, আড়ালেই রাখেন। সোশ্যাল মিডিয়াতেও তেমন সক্রিয় নন। বিতর্ক থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকারই চেষ্টা করেন। বারবার বঞ্চনার শিকার হলেও ক্ষোভ উগরে দিতে বা অন্য কাউকে দোষারোপ করতে দেখা যায় না। জাতীয় দলের আঙিনা থেকে দূরে কাটাতে হয়েছে। আইপিএলেও খেলতে পারেননি। একাকী তাঁর দিন কেটেছে বেঙ্গালুরুর এনসিএ-তে। নিঃশব্দে চলেছে ফিরে আসার লড়াই। সারাক্ষণ ছবি সাঁটিয়ে নিজেকে প্রাসঙ্গিক রাখার ঝোঁক নেই। 'ফিরে আসছি' এমন বার্তা দেওয়াও নেই। জানতেন, ফিরতে হলে, ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেই ফিরতে হবে। নির্বাচকরাও বারবার বললেন, ফিটনেস প্রমাণ করতে হবে। গত দু'বছরে সেটাই তো করে গেছেন। বাংলার হয়ে বল হাতে আগুন ঝরিয়েছেন। কতটা

ফিট, কতটা ছন্দে বারবার বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও কোনও এক রহস্যজনক কারণে দরজা বন্ধই থেকে গেছে।

আচ্ছা, ভারতীয় ক্রিকেট কি সামির বিকল্প পেয়ে গেছে? সাম্প্রতিক নিউজিল্যান্ড সফরের কথাই ধরা যাক। বুমরা, সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণদের টেস্ট সিরিজের কথা ভেবে বিশ্রাম দিতে হচ্ছে। একদিনের সিরিজে সবথেকে অভিজ্ঞ বোলারের নাম কিনা অর্শদীপ সিং! সঙ্গী কারা? আকিব নবি, গুরনুর ব্রার, অংশুল কম্বোজ। চারজন মিলিয়ে কটা টেস্ট খেলেছেন? উত্তর হল, এক। একমাত্র অংশুল কম্বোজ একটি টেস্ট খেলেছেন। বাকি তিনজনের এখনও টেস্ট অভিষেকই হয়নি। আচ্ছা, এই চারজন মিলিয়ে কটি একদিনের ম্যাচ খেলেছেন? অর্শদীপ ২০টি। বাকি তিনজন মিলে সাতটি। অর্থাৎ, চারজন মিলে ২৭টি। এঁরা আগামীদিনে হয়তো পরিণত হবেন। হয়তো আরও অনেক ম্যাচ খেলবেন, জেতাবেন। কিন্তু এঁরা কেউই সামির বিকল্প নন। এখনও অনেকটা পথ তাঁদের হাঁটতে হবে।

আসল কথাটা হল, ভারতীয় বোলিংয়ে কী এমন মহাতারকার আবির্ভাব ঘটল যে সামিকে টানা দু'বছর এভাবে বসিয়ে রাখা হল? নির্বাচকদের ক্রমাগত উপেক্ষা সত্ত্বেও ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। প্রতিটি ম্যাচে খেলেছেন। বাংলাকে একের পর এক ম্যাচে জিতিয়েছেন। লম্বা স্পেলে টানা ১২ ওভার, ১৫ ওভার করে বল করেছেন। একজন জোরে বোলার আর কী করতে পারেন? কেন একবুক অভিমান নিয়ে সামির মতো বোলারকে এভাবে সরে দাঁড়াতে হল, তার আত্মসমীক্ষা হওয়াটা খুব জরুরি। ভাল পারফর্ম করলে ফিরে আসা যায়, এই স্বপ্নকে সামনে রেখেই একজন ক্রিকেটার নিজেকে উদ্দীপ্ত করেন। কিন্তু নির্বাচকদের আচরণ বুঝিয়ে দিল, একবার তোমাকে ছেঁটে ফেলেছি মানে তোমার দরজা বন্ধ। আর এদিকে ঘুরেও তাকিও না।

এভাবেই অবসর নিতে বাধ্য করা হয়েছে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বিন, চেতেশ্বর পুজারাদের। যদি বিদায় জানাতেই হয়, সেই পথটা কি সম্মানজনক হতে পারে না? কীভাবে সৌরভ গাঙ্গুলি, অনিল কুম্বলে বা শচীন তেন্ডুলকারদের বিদায় জানানো হয়েছিল, এখনকার বোর্ডকর্তারা কি সেটা ভুলে গেছেন? গত দশ বছরে অনেক বড় মাপের তারকা এসেছেন। কিন্তু প্রত্যেককেই চমর অপমানিত হয়ে, একবুক যন্ত্রণা নিয়ে সরে দাঁড়াতে হয়েছে। হে মোর দুর্ভাগা দেশ। অর্থের দম্ভে শিষ্টাচার, সৌজন্য সবই হারিয়ে ফেলছেন বোর্ডকর্তারা। বিরাট, রোহিত, সামিরা থেকে যাবেন ক্রিকেটপ্রেমীদের হৃদয়ে। কিন্তু এই বোর্ডকর্তারা? ইতিহাসের ফুটনোটেও এঁদের জায়গা হবে না।



রিনচেনপং

রবি ঠাকুর কিন্তু এখানে এসেছিলেন

উত্তম জানা

কবীর সুমনের সেই চেনা গানের লাইন, ‘আমার আর কোথাও যাওয়ার নেই, কিচ্ছু করার নেই।’

বিশ্বাস করুন, পাহাড়ি গ্রাম রিনচেনপংয়ে গিয়ে ঠিক এই কথাগুলোই মনে পড়ছিল। গানটা পুরোটাই জানা। ফলে, তিনদিনের সফরে বেশ কয়েকবার গেয়েওছিলাম। সফরসঙ্গী বন্ধু একটুও বিরক্ত হয়নি। বরং বারবার শুনতে চাইছিল। গলার গুণে নয়, গানটার গুণে। আরও বেশি করে প্রকৃতির গুণে। আসলে, পাহাড় মনের মধ্যে অদ্ভুত এক উদারতা এনে দেয়। তখন বেসুরো গানকেও দিব্যি হজম করা যায়।

সত্যিই কোথাও যাওয়ার তাড়া ছিল না। কিছুই করার ছিল না। সব ব্যস্ততাকে পিছনে ফেলেই

আশ্রয় নিয়েছিলাম পাহাড়ের কোলে। পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে কখনও কখনও মনে হয়, কোথাও না গেলেই বোধহয় সবচেয়ে ভাল হয়।

দার্জিলিং, গ্যাংটক, পেলিং—দর্শনীয় জায়গার তালিকা হাতে নিয়ে পাহাড়ে পৌঁছে আমরা ছুটতে থাকি। এই ভিউপয়েন্ট, ওই মঠ, আর একটু দূরে জলপ্রপাত—একটার পর একটা জায়গা টিক দিতে টিক দিতে কখন যে পাহাড়ের আসল সৌন্দর্যটাই হারিয়ে ফেলি, টেরও পাই না। রিনচেনপং সেই তাড়া থেকে মুক্তি দেয়। রিনচেনপং গ্রামটার কথা দু–একটা পত্রিকায় ইতি উতি পড়েছিলাম। তখনও ইউটিউবের এমন রমরমা হয়নি। তাই পড়েই মনে মনে একটা দৃশ্যকল্প সাজিয়ে ছিলাম। গিয়ে দেখলাম, যা ভেবেছিলাম, তার চেয়ে ঢের সুন্দর।

পশ্চিম সিকিমের এই ছোট্ট পাহাড়ি জনপদে পৌঁছে মনে হয়, এখানে কিছুই করার নেই। আর সেই 'কিছুই না করা'-টাই যেন সবচেয়ে বড় কাজ। আমরা দুই বন্ধু গিয়েছিলাম বর্ষার সময়ে। এই বৃষ্টির সময়ে অনেকেই পাহাড়কে এড়িয়ে চলেন। টানা বৃষ্টি হলে ঘরবন্দি হয়েই কেটে যায়। কিন্তু ওই যে, আমাদের কোথাও যাওয়ার ছিল না। তাই, ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা ছিল না। বর্ষায় রিনচেনপংয়ের রূপ আরও অন্যরকম। মেঘ এসে পাহাড়ের গায়ে বসে থাকে। কখনও চারপাশ একেবারে সাদা, কিছুই দেখা যায় না। আবার হঠাৎ মেঘ সরে গেলে দূরে পাহাড়ের শরীর দেখা যায়। বৃষ্টির ফোঁটা টিনের ছাদে টুপটাপ শব্দ করে। আর আপনি বসে আছেন ডাকবাংলোর বারান্দায়।

রিনচেনপংয়ের সেই পুরনো ফরেস্ট ডাকবাংলো যেন এই অলস সৌন্দর্যেরই অংশ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই অঞ্চলে এসেছিলেন—তাঁর পদচিহ্নের স্মৃতি রিনচেনপংয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। পাহাড়ে যত যাই, এই মানুষটার ওপর যেন শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়। এত বছর আগে, এই দুর্গম পাহাড়েও তিনি এসেছিলেন! আম বাঙালি এত বছর পরেও যার হদিশ জানে না, সেখানে এত বছর আগে তিনি এই জায়গার সন্ধান পেলেন কীভাবে? নিশ্চয় এখানে কোনও কবিতা বা গানও লিখেছেন। রবীন্দ্র জীবনীকাররা জানলেও জানতে পারেন।

তবে, ডাকবাংলোটি সত্যিই চমৎকার। অনেকটা খোলা জায়গা। আর সামনে লম্বা বারান্দা। এখানে হেলানো চেয়ারে বসে থাকার রোমাঞ্চই আলাদা। বারান্দায় বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৃষ্টি দেখা যায়। কোনও বই পড়তে পারেন, চা খেতে পারেন, কিংবা কিছুই না করে শুধু মেঘের ওঠানামা দেখতে পারেন।

তবে ডাকবাংলোটি এখন পর্যটকদের জন্য নিয়মিত খোলা থাকে কি না, যাওয়ার আগে অবশ্যই স্থানীয় বন দফতরের সঙ্গে খোঁজ নিয়ে নেওয়া ভাল। আর যদি ডাকবাংলোয় থাকা না-ও হয়, মন খারাপ করার কিছু নেই। রিনচেনপংয়ে এখন বেশ কিছু সুন্দর হোমস্টে তৈরি হয়েছে। কাঠের ঘর, জানলার বাইরে পাহাড়, ঘরোয়া রান্না— আর সবচেয়ে বড় কথা, আতিথেয়তায় সেই পুরনো পাহাড়ি আন্তরিকতা। শহুরে হোটেলের 'সার্ভিস'-এর সঙ্গে যার কোনও তুলনাই হয় না। সন্ধ্যায় হয়তো বাড়ির লোকের সঙ্গে গল্প জমবে। রান্নাঘর থেকে ভেসে আসবে গরম ভাত, ডাল, পাহাড়ি সবজি কিংবা স্থানীয় কোনও রান্নার গন্ধ।

রিনচেনপং যেতে হলে কলকাতা থেকে প্রথমে নিউ জলপাইগুড়ি। সেখান থেকে গাড়িতে সিকিমের দিকে। জোরথাং হয়ে রিনচেনপংয়ের রাস্তা ধরা যায়। দূরত্ব খুব বেশি নয়, কিন্তু পাহাড়ি রাস্তার সৌন্দর্যের জন্য সময় হাতে রাখা ভাল। শিলিগুড়ি থেকে গাড়িতে মোটামুটি চার–পাঁচ ঘণ্টার পথ।

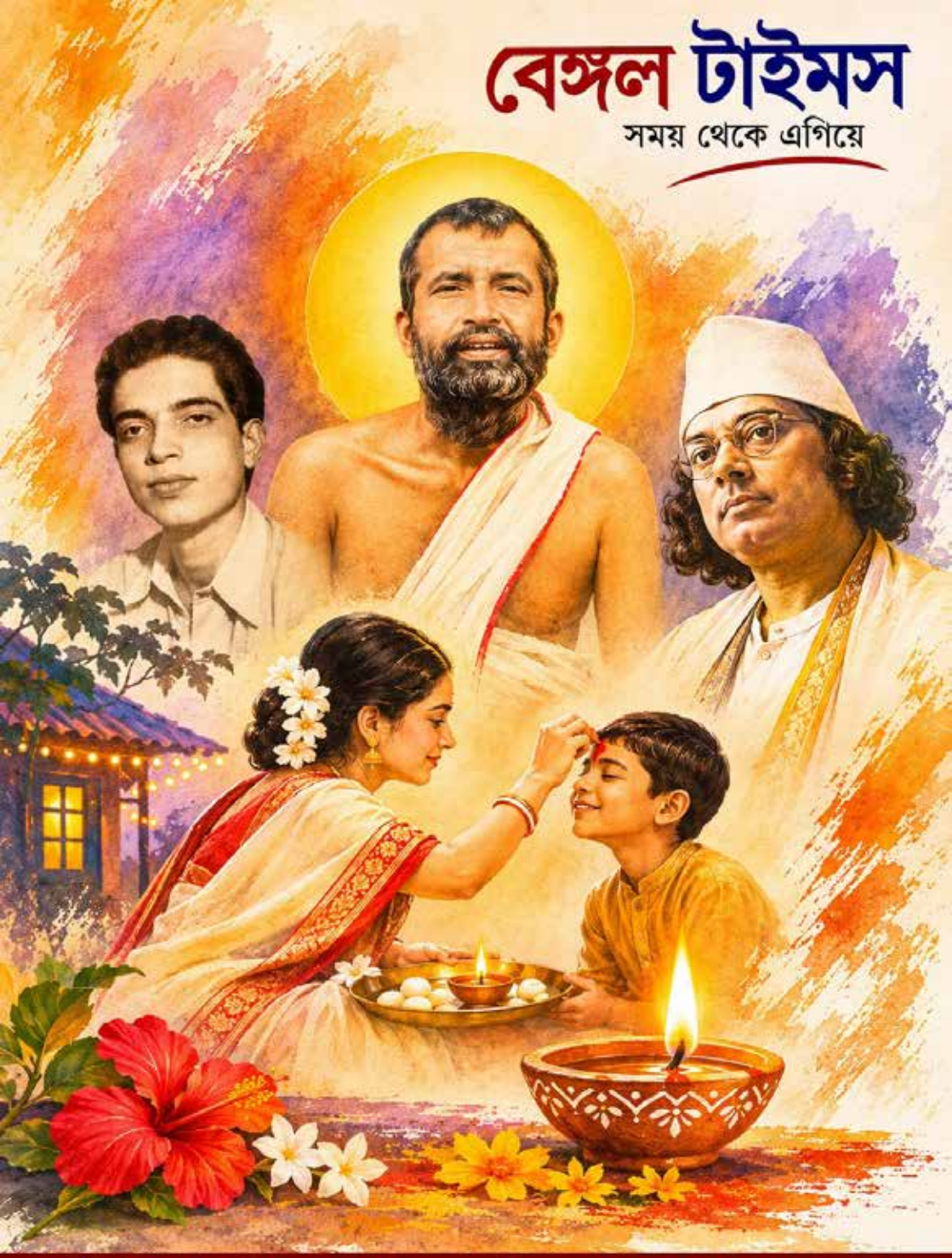
ভোরে ঘুম ভাঙুক পাখির ডাকে। জানলা খুলে দেখুন, পাহাড়ের গায়ে আলো কীভাবে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে। সকালের চা শেষ করে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে পড়ুন। কোনও গন্তব্যের প্রয়োজন নেই। সরু রাস্তা ধরে হাঁটুন। দু'পাশের বাড়ি দেখুন। পাহাড়ি মানুষের দৈনন্দিন জীবন দেখুন। কোনও অচেনা পাখির ডাক শুনে থমকে দাঁড়ান। ইচ্ছে হলে কোনও বাড়িতে ঢুকেও পড়তে পারেন। এটুকু বলতে পারি, গৃহকর্তা বিরক্ত হবেন না। চা খেতে খেতে গল্প জুড়ে দিতেই পারেন। অনেকটা সেই তু মান ইয়া না মান, ম্যায় তেরা ম্যাহেমান–এর মতো।

বিকেলে আকাশ বদলাতে দেখুন। সন্ধে নামুক খুব ধীরে। পাহাড়ে সন্ধে আসলে যেন কেউ আলোটা একবারে নিভিয়ে দেয় না—আস্তে আস্তে রং বদলায়। তারপর অন্ধকার। রিনচেনপংয়ের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হয়তো কাঞ্চনজঙ্ঘার দৃশ্যও নয়। সুমন দিয়ে শুরু করলাম। এবার নচিকেতায় আসাই যায়। মনে হবে, 'যখন সময় থমকে দাঁড়ায়।' এখানে কোথাও যাওয়ার তাড়া নেই। কোনও দর্শনীয় স্থান দেখতেই হবে না। কোনও ছবি তুলতেই হবে না। শুধু বসে থাকুন।

বৃষ্টি দেখুন। মেঘ দেখুন। পাখির ডাক শুনুন। নিজের সঙ্গে একটু কথা বলুন। সফরসঙ্গীর জীবনের কত অজানা কথা আপনি জানেন না। এই সুযোগে জেনে নিলে মন্দ কী! সবার বুকেই অনেক কথা জমে থাকে। পাহাড়ই পারে অনেক না বলা কথার স্রোতকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিতে। সেই বহতা নদী আপন বেগে পাগলপারা হয়ে বয়ে যাক।

বেঙ্গল টাইমস

সময় থেকে এগিয়ে



bengaltimes.in | ISSN 2445 5657